শা র দ স ং খ্যা

জেলার খবর সমীক্ষা

০ ন|ব|ম|ব|র্ষ ০

: আশ্বিন ১৪২২ :: অক্টোবর ২০১৫ :

বিষয় ভাবনা ঃ প্রসঙ্গ বিবাহ

ভারতের বিবাহ (একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা)
দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী ৪
হিন্দু বিবাহের মন্ত্র
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ৭
বিবাহ বার্তা
অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ১১
বিয়ের গান
ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩
আমাদের সমাজের বিয়ের গানের নমুনা
শ্যামল বেরা ১৫
বিয়ে নট আউট
প্রদীপ ভট্টাচার্য ১৬
রকমারী বিবাহ কথা
ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৯
খ্রীষ্টান বিবাহের রীতিনীতি
স্নিগ্ধা বিশ্বাস ২১
মুসলমান বিবাহ বা নিকাহ
রেওয়াজ আহমেদ ২১
শুভ বিবাহের ছড়া
তাপস বাগ ২২
বিয়ে নিয়ে — প্রচলিত প্রবাদ
লমা রমা কুৎনস ২৪
ভোজ কয় যাহারে
জহর চট্টোপাধ্যায় ২৫
উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধবা বিবাহের সামাজিক ব্যাকরণ
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৩
বিবাহ বিচিত্রা
কালীপদ চক্রবর্তী ৩৬
বিবাহ আসলে বন্ধুত্ব
শীলা পাল ৪১
কুল বিবাহের ইতিহাস
ডা. শুভেন্দু ভট্টাচার্য ৩৮

রম্য বিয়ে ঃ

বিবাহ সূত্রে পঞ্চগাথা
পল্টু ভট্টাচার্য ৩৮
মহামায়ার মর্তে আসা
শ্রীতমা মুখার্জী ৩৯

বিশেষ রচনা ঃ

জব চার্নকের বিবাহ
ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ ২৮

ভ্রমণ ঃ

তুষারতীর্থে ভ্রমণ
সুজয় বাগচী ৪৩

বিবাহের ছন্দবাণী ঃ

সাদিকে বিশ সাল বাদ
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ১০
গদাই রায়
প্রদীপ ভট্টাচার্য্য ৬
সত্যি বিয়ের গল্প
প্রণবকুমার দাস ১৮
পণ্য না পণ
মালতী দাস ১২
বাঁচতে গেলে হাসতে হবে
বিনয় সরকার ৪০
বিয়ে মানে
সুখেন্দু বিকাশ পাল ৪২
ভূতা দিদির বিয়েতে
গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ৪২

ছোটদের পাতা ঃ ৪৫ - ৫২

সম্পাদকীয়

বেয়াড়া আবহাওয়ার দাপটে এবছরে সকলেই অস্থির। একে তো গরমকালে অসহ্য গুমোট গরম আর তারপর শুরু হল লাগমাছাড়া বৃষ্টি আর ঘনঘন নিম্নচাপের উৎপাত। প্রবল বৃষ্টিতে উত্তর আর দক্ষিণ দুই বঙ্গেই বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, জীবনহানিও কম ঘটেনি। অগ্নিমূল্যের বাজার এখন কিছুটা স্থিতিশীল, ডেঙ্গু আর ম্যালেরিয়ার বাড়ন্ত প্রকোপও অনেকটা কমের মুখে। আকাশে সাদা মেঘ, শরতের সোনা রোদ বৃষ্টির ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে ঘোষণা করছে আনন্দময়ীর আগমন বার্তা। পুজো এসে গেছে।

পুজো মানেই শারদসংখ্যা। গতবার থেকে বিষয়ভিত্তিক ভাবনায় রঞ্জিত পত্রিকা। এবারের বিষয়বস্তু বিবাহ। ধর্মীয় সামাজিক, জাতিগত দিক ছাড়াও আলোচিত হয়েছে বিবাহের গান, রীতিনীতি, মেনুকার্ড আর ভোজের কথা। সঙ্গে আছে ছোটদের পাতা।

ছোট পত্রিকা প্রকাশে বাধা অনেক। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ভুলত্রুটি থেকেই যায়। পত্রিকার সুহৃৎ যাঁরা তাঁরা এইসব ছোটখাট ত্রুটিকে ক্ষমার চোখেই দেখবেন এই আমাদের আশা। সেইসঙ্গে এই আশা বিঘ্নবিনাশক আনন্দময়ীর আগমনে অকালবর্ষণ দূর হোক, উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলি সকলের ভালো কাটুক।

পত্রিকার সব লেখক-লেখিকা, গ্রাহকবর্গ, বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা প্রকাশে সংশ্লিষ্ট মুদ্রক ও অন্যান্য শুভানুধায়ীদের সকলকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শা র দ স ং খ্যা র উ দ্বো ধ ন

মহালয়ার পূর্ব দিবসে, ১১ অক্টোবর ২০১৫

হাওড়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সভাকক্ষ

প্রকাশ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আয়োজনে **'সু র ও ক থা'**

অংশগ্রহণে 'সুর ও কথা'র শিশু শিল্পীরা

সঞ্চালনা ঃ মহুয়া দাস

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ভাতেঘরী জনকল্যাণ সমিতি

ভাতেঘরী, জয়পুর, হাওড়া - ৭১১৪০১

মানস কুমার মাজী (৯৯৩২০০৭১৬১)

সুর ও কথা

আবৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র

ঃ প্রতি শনিবার ঃ

মাধব ঘোষ লেন, খুরুট,

ঃ প্রতি রবিবার ঃ

ডুমরাজলা, এইচ. আই. টি. কোয়াটার্স

যোগাযোগ - ৮০১৩৩৭৮১৬৫/৯৮৩০৪৭৬০২০

With Best Compliments From

A WELL WISHER

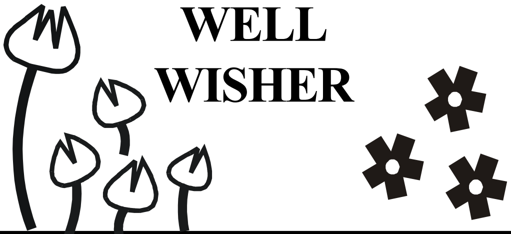

SAROJIT MANNA

ভারতের বিবাহ (একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা)

দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী

জীব জগতের মধ্যে অধিকাংশ প্রাণীরই সন্তান উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট ঋতুতে যৌন মিলনের আকাঙ্খা জাগে। কিন্তু একমাত্র মানুষই তার ব্যতিক্রম। মানুষের যৌন আকাঙ্খা সব ঋতুতেই জাগ্রত থাকে। সেজন্য স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের সান্নিধ্যে থেকে পরিবার গঠন করে এবং সন্তানদের লালন পালন করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানব সন্তানই পরনির্ভর তথা মাতৃ নির্ভর। অন্য প্রাণী ভূমিষ্ঠ হবার পরই মাতৃদুগ্ধের সন্ধান স্বভাবগতভাবে পেয়ে যায়, মানব সন্তানের ক্ষেত্রে স্বীয় চেষ্টায় পেতে পারে না। এইভাবে সে পরিবারভুক্ত জীব হিসাবেই সাধারণত বর্ধিত হয়।

ভারতে সংস্কৃতভাষী আর্যদের আসার আগেই যে বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মিলন ঘটেছিল তাদের মধ্যে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর গুরুত্বই বেশি ছিল বলে পন্ডিতদের ধারণা। কঠোর নিয়মানুযায়ী অসবর্ণ বিবাহ ছিল নিন্দনীয়।

একটু ভিন্ন কথায় যাওয়া যাক - 'হরফ' প্রকাশনী থেকে বাংলা ভাষায় ঋগ্বেদ গ্রন্থের প্রকাশক মাননীয় আবদুল আজিজ আল আমান 'কিছু বিনীত নিবেদন'-এ বলেছেন, 'পাশ্চাত্য দেশসমূহে বেদের চর্চা যে পরিমাণ হয়েছে আমাদের দেশে তার এক দশমাংশও হয়নি।' কথাটি মর্মান্তিকভাবে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রকাশক মশাইয়ের আরও কয়েকটি কথা প্রাণিধানযোগ্য — তাদের মধ্যে একটি ঃ 'যে ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে আজ ভারতবর্ষ আকুল, ঋগ্বেদের আমলে কিন্তু সে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়নি। তখন জাতি বলতে মাত্র দুটি শ্রেণী বুঝাত — আর্য ও অনার্য (দস্যু)।'

রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম খন্ডের ভূমিকা লিখেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আর্য সমাজে স্ত্রীজাতি বিশেষ সন্মানিতা ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে একত্রে বসে যজ্ঞে অংশ নিতেন (ঋগ্বেদ সংহিতা ১/১৩১/৩ ও ৫/৪৩/১৫)। স্ত্রীলোক ঋষির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। বিশ্বশরা ঋগ্বেদের ৫ম মন্ডলের ২৮ সূক্তের ঋষি। এ থেকে দেখা যায় স্ত্রীলোকেরাও ঋষি বলে গণ্য হতেন এবং বেদমন্ত্র রচনা করতে পারতেন। দেখা যায় তিনি ঐ সূক্তের তৃতীয় ঋকে বলছেন 'সং জাম্পত্যং সুযমমা কৃণুস্ব' — অর্থাৎ অগ্নির কাছে বলা হচ্ছে বা প্রার্থনা করা হচ্ছে তুমি আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক সুশৃংখলাবদ্ধ করে দাও।

অনেক বিদুষী নারী সেই প্রাচীনকালে ব্রহ্মজ্ঞা রূপে খ্যাতা হয়েছিলেন। যেমন অত্রির কন্যা অপালা, ঋগ্বেদের ৮ম মন্ডলের ৯১ সূক্তের রচয়িত্রী। কক্ষীবানের কন্যা ঘোষা ঋগ্বেদের দুটি সূক্তের রচয়িত্রী (১/১১৭/৭ এবং ১০/৪০/১)। ইনি কুমারী অবস্থায় কুষ্ঠ রোগগ্রস্থা হয়েছিলেন। তখন রাজবৈদ্য (স্বর্গবৈদ্য নামে খ্যাত অশ্বিনীকুমারদ্বয়) অশ্বিনী ও রেমন্ত নামের দু'ভাই তাঁর চিকিৎসা করেন ও সারিয়ে তোলেন। আর এক প্রখ্যাতা নারী ছিলেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ — যাঁকে বাগ্দেবীর সঙ্গে তুলনা করা হয় — অর্থাৎ বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর সঙ্গে। এঁর রচিত ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১২৫ সূক্তটি শ্রী শ্রী চন্ডীর সঙ্গে অবশ্যই পাঠ্য রূপে স্বীকৃত।

কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেকার আর্যসমাজে নারীর যে রকম শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন ছিল, যে অধিকার ছিল সে বিবরণ আমাদের মুগ্ধ করে। বহু অবিবাহিতা নারী সারা জীবন পিতৃগৃহে মর্যাদার সঙ্গে বাস করতেন। তাঁদের উপবীত ধারণেরও অধিকার ছিল।

পুরুষদের সঙ্গে নারীদের প্রাচীনকালে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মনুস্মৃতির পরিশিষ্টে যে শ্লোকসমূহ আছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল —

পুরাকালে কুমারীণাং মৌঞ্জী বন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।

প্রাচীনকালে মেয়েদের মৌঞ্জীবন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়নকালেও এক কৃত্য অর্থাৎ উপনয়নই বোঝায়। অর্থাৎ প্রাচীনকালে কুমারী কন্যার উপনয়ন দেবার বিধি ছিল।

কিন্তু প্রাগার্য সভ্যতার কালে সুখী সমৃদ্ধ নগর সভ্যতার আড়ালে বিবাহপ্রথা কেমন ছিল, কিভাবে পতি-পত্নী নির্বাচন হতো, কোন ভাষায় মন্ত্রাদি পাঠ হ'তো বা আদৌ অন্য কোন রীতি অনুসৃত হতো কি-না, সে বিষয়ে অদ্যাবধি সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ না পাওয়ায় সে যুগের বিবাহরীতি সম্বন্ধে নীরবতাই শ্রেয়।

ভারতে একরকম সমাজব্যবস্থা হতে পারেনি। সুপ্রাচীন কাল

থেকে আদিবাসীরা আর্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। তারাও একটা সংস্কৃতির ধারক। তাদের সমাজও পৃথক পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং প্রতি গোষ্ঠীই তার নিজস্ব প্রথাকে যথাসম্ভব রক্ষা ক'রে চলছে। তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ভিন্নতার দাবী রাখে।

আবার আর্যসমাজ পরিপূর্ণভাবে দলবদ্ধ একটি ধারার জন্ম দেবার আগে স্বীয় বংশধারার মর্যাদাকেই প্রাধান্য দিয়ে আসতো। — এখনও ভারতবর্ষে আর্যজাতি পরে হিন্দু নামে অভিহিত জাতি বিশেষ সর্বত্র একই রীতি পদ্ধতির ধারা বহন করে না।

'নানাভাষা নানামত নানা পরিধান' নিয়ে যে ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে তাতে বিভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু যে পদ্ধতিতেই হোক বা যে রীতি অনুশাসন মেনেই হোক — একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রীতির মধ্য দিয়ে 'বিবাহ'নামক অনুষ্ঠানটি ভারতবর্ষে চলে আসছে। প্রাক্ বৈদিক যুগের বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে অনবহিত হলেও ধরে নিতে হবে তারই রেশ ধরে একটি বিশেষ পদ্ধতি 'দেশাচার' 'কুলাচার' প্রভৃতির মাধ্যমে ঘটে চলেছে।

হিন্দু সমাজে সগোত্রে বিবাহ হয় না, তেমন একই টটেমের পাত্র-পাত্রীর নিজেদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নয়। হিন্দু সমাজে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হল রক্তধারার পরিবর্তন যা জীববিজ্ঞান স্বীকৃত।

ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, জনসংখ্যাও বিপুল। 'হিন্দু' নামধেয় সম্প্রদায় হিসাবে একটি সম্প্রদায় হলেও বহুধা বিভক্ত। যদি বাঙালী হিন্দু হিসাবেই ধরা হয় তবে সহস্রভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সমাজ। কেউ জল-চল, কেউ জল-অচল। সুতরাং এক্ষেত্রে এক সমাজ আর এক সমাজকে ঘৃণা করে এবং জল-অচল বলে মনে করে — সামাজিক দিক থেকেই। তবু এই বঙ্গীয় সমাজেই হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ছোঁয়ায় একটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারা নিজ নিজ সমাজের আবর্তে বহমান হয়ে আছে তারই কিছু ছোঁয়া দেবার প্রয়াস পাব।

প্রথমেই বলে নিই আমার কিছু অজ্ঞতা তথা বোঝার ভুল আছে। হিন্দু সমাজে বর্তমানে স্ত্রীলোক এবং শূদ্রদের 'ওঁ' মন্ত্র উচ্চারণ নিষেধ। সে স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূতা হলেও তিনি কখনও 'ওঁ' বলতে পারবেন না — বর্তমান ব্রাহ্মণ্য বিধানে। কিন্তু সামবেদী বিবাহ বিধিতে বধূকে মন্ত্র পড়াবার বিধান আছে (অবশ্য মন্ত্রটি বধূ না-ও পড়তে পারেন, তখন বরই পড়বেন)। মন্ত্রটি 'ওঁ প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।' পরেরটি ধ্রুবতারা দর্শনের মন্ত্র — 'ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।'

ঋগ্বেদের সপ্তম মন্ডলে (৭/২/৫) সমন উৎসবের কথা আছে। এই উৎসবে সুদক্ষ শস্ত্রজীবী, ক্রীড়াবিদ, যোদ্ধা, ধনুর্বিদ, নট, কবি প্রমুখ যোগ দিতেন। দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তাঁরা পুরস্কার লাভ করতেন। এই উৎসবে মেয়েরাও যোগ দিতেন। এখানে অনূঢ়া মেয়েরাও পতিলাভের ইচ্ছায় আসতে পারত। — অর্থাৎ রাজকন্যাদের স্বয়ম্বর সভার মতো পতিনির্বাচনের ব্যবস্থা। পুরাকালে এই রকম পতিনির্বাচনের ব্যবস্থাও ছিল।

সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণ-সঙ্করের পক্ষে বলেননি। সমাজে বর্ণ সঙ্কর যাতে না জন্মায় সে বিষয়ে সব আলোচকই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

আট প্রকার বিবাহের কথা শাস্ত্রে আছে। যথা — ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ। ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রথম ছয়টি বিবাহ ধর্ম সম্মত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শেষ চারটি এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষ্যে আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহ ধর্মসম্মত। আবার কোন কোন পন্ডিত বলেছেন প্রথম চার রকমের বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে উপযুক্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উপযুক্ত রাক্ষস বিবাহ, বৈশ্যের পক্ষে ও শূদ্রের পক্ষে উপযুক্ত আসুর বিবাহ।

বিদ্বান, চরিত্রবান ও যশস্বী পাত্রকে নির্বাচন করে পাত্রীদান করা বিধেয়। সর্বক্ষেত্রেই এই মত গ্রহণযোগ্য।

বিবাহের সময় পাত্র পাত্রীর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেন — 'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।' অর্থাৎ, তোমার মন আমার মন হোক, আমার মন তোমার মনের সাথে মিলে যাক। — দু'জনের মন একইরকম হোক — যাতে কোন বিবাদ বিসংবাদের সৃষ্টি না হয়।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র - প্রযোজক মনু বলেছেন,

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া।।

অস্যার্থ - নারীরা সেখানে সম্মানিতা হন, দেবতারা সেখানে আনন্দিত হন। কিন্তু যেখানে তাঁরা অসম্মানিতা হন, সেখানে সে কার্য অসফল হয়।

প্রতিপ্রাণা ভার্যাই ভার্যা, তিনিই ভার্যা যিনি সন্তানের মা, যিনি স্বামীর আজ্ঞানুবর্তিনী এবং মনে, কাজে এবং কথায় পবিত্রা।

(সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্যা যা প্রজাবতী। মনোবাক

কর্মভিঃ শুদ্ধা পত্যাদেশানুবর্তিনী।)

বিদেশিনী ভার্যাগ্রহণ বাণিজ্যিক কারণে সুপ্রাচীনকালে বিদেশে যাওয়া থেকেই চালু রয়েছে — বর্তমানকালেও তা অব্যাহত। একান্নবর্তী পরিবার আর নেই বললেই চলে। শাশ্বত বোধ হয় ঘর বাঁধার চাহিদা — যার পিছনে ক্রিয়াশীল - আজকের একশ্রেণীর মানুষের আত্মসুখ। সেখানে শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রেমের স্থান ক্রমশ গ্রহণ করছে আত্মসুখ লাভের বাসনা। 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' যে সামাজিক দৃষ্টি তার সঙ্গেই সংঘাত আজ আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারার। সামাজিক চিন্তা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। আজ 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' প্রবচনটির প্রতিষ্ঠায় সামাজিক মানুষরা অগ্রসর হবেন এই প্রত্যাশা রেখে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ শেষ করলাম।

ঃ গ্রন্থঋণ ঃ

ঋগ্বেদ ('হরফ' প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত) / **ভারতের বিবাহের ইতিহাস** - অতুল সুর

পুরোহিত দর্পণ - সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য / **মনুসংহিতার শূদ্রভাষ্য** - সুকুমার সিকদার / **ভারতের নারী** - উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য।

শারদীয়া ফেলুদা ক্যুইজের উত্তর ঃ

১. ছবিতে নরেশ পাকড়াশি শম্ভুচরণ বোসের লেখা তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী টাইপ করছেন, ২. ফেলুদার রিভালবারটির নাম কোল্ট পয়েন্ট ৩২, ৩. মগনলালের প্রাইভেট সার্কাসের 'নাইফ থ্রোয়ার' অর্জুন লালমোহন বাবুর দিকে 'নাইফ' ছুঁড়ছিল, ৪. ফেলুদার হাতে এই বিশেষ ধরনের জুতোর নাম নাগরা, এই জুতো যে কোন পায়েই গলানো যায়, ৫. ফেলুদা হংকং শহরে।

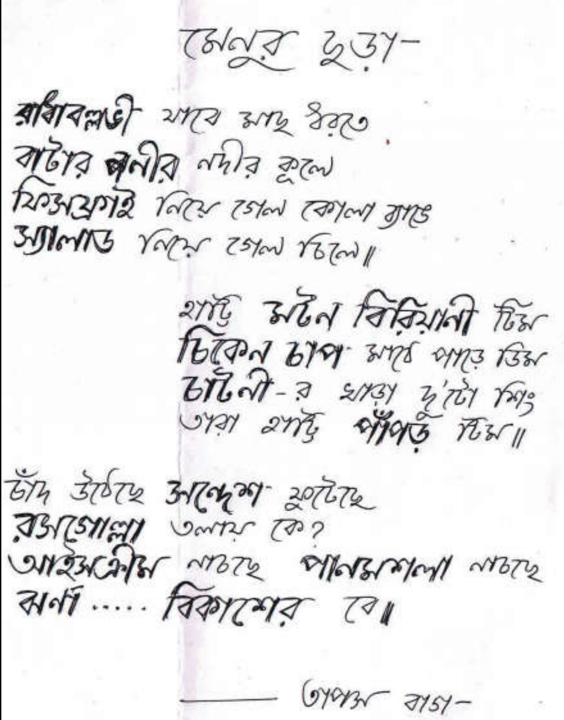

মেনুর ছড়া-

রাধাবল্লভী যাবে মাছ ধরতে
বাটার পনীর নদীর কূলে
ফিসফ্রাই নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে
স্যালাড নিয়ে গেল চিলে॥

হাণ্ডি মটন বিরিয়ানী টিম
চিকেন চাপ মাথে পাড়ে ডিম
চাটনী-র খাড়া দু'টো শিং
তারা হাণ্ডি পাঁপড় টিম॥

চাঁদ উঠেছে সন্দেশ ফুটেছে
রসগোল্লা তলায় কে?
আইসক্রীম নাচছে পানমশলা নাচছে
ঝর্না ..... বিকাশের বে॥

— তাপস রায়-

ছড়ায় লেখা বিয়ের 'মেনু কার্ড'

১২ অগাষ্ট, ২০১৩

গদাই রায়

প্রদীপ ভট্টাচার্য্য

এক বিয়েতে নেই রক্ষা কুসুমপুরের গদাই রায়
তিনটি বিয়ে করার দায়ে দ্যাখো কেমন শ্রীঘর যায়!
পাড়ার লোকে অবাক সবাই একটা বউকে কে সামলায়!
কেনরে তুই গদাই বাছা, পড়তে গেলি এই ঝামেলায়?
একটা বিয়ে নদিয়াতে, বিষ্ণুপুরে আর একটা
তারপরেতেও দম আছে তো, মেদিনীপুরে তৃতীয়টা!
বরেরা যেই বাইরে বেরোয় বড়য়েরা সব সজাগ থাকে
যাচ্ছো কোথায়, ফিরবে কখন সরাসরি প্রশ্ন তাকে
গদাই, তোমার বউয়েরা কি এতই ভালো, প্রশ্নবিহীন?
তিনটি বউকে ম্যানেজ করে কোথায় থাকো রাত্রি ও দিন?
একটা বউও শুধায় না কি, কোথায় থাকো সপ্তা জুড়ে
চারপাঁচ রাত কোথায় ছিলে কোথা থেকে এলে উড়ে?
ধন্য তুমি গদাইবাবু, এলেম তোমার আছে বটে!
তিনটে বউকে সামলে চলতে বুদ্ধি কিছু লাগে ঘটে
তবে সব ভালো যার শেষ ভালো সেটাই তো আর হল না ভাই,
বিয়ের পরে বিয়ে করে সুখে থাকার আশাতে ছাই।

হিন্দু বিবাহের মন্ত্র

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

হিন্দু বিয়েতে সাধারণত যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় বা যে পদ্ধতিতে বিয়ে দেওয়া হয় তার খুব সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা এই লেখাটির মধ্যে দেওয়া হল। বিয়ের অনুষ্ঠানে বর কনে ছাড়াও থাকেন পুরোহিত (যিনি মন্ত্র পড়ান) ও সম্প্রদানকারী (যিনি কন্যা পক্ষের তরফে কন্যা সম্প্রদান করেন)। লেখাটিতে বিভিন্ন জায়গায় 'অমুক' মন্ত্রটি ব্যবহার হয়েছে। কারণ বিয়ে হয় বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন পক্ষে সম্প্রদাতা ও বর পক্ষ উভয়েরই গোত্রও আলাদাও হতে পারে, নামতো বটেই তাই যথাযোগ্য স্থানে মাস, তিথি ও নামধাম বসিয়ে নিলেই এই মন্ত্রমালা সম্পূর্ণতা পেয়ে যাবে। লেখাটির মূল উদ্দেশ্য হল বিয়ের মন্ত্রকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা। আচার বিচারের বিষয় কিন্তু আলাদা।

আশীর্বাদের বেলায় অনেকক্ষেত্রে আলাদা অনুষ্ঠান হলেও বিয়ের দিন বয়স্ক মানুষজন বর কনে দু'জনকেই ধান, দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন এটাই হিন্দু বিয়ের রীতি। মন্ত্রগুলি নেওয়া হয়েছে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'পুরোহিত দর্পণ' থেকে।

ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু আর মহিলা ও অব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু এই আচরণ মন্ত্রটি প্রযোজ্য হয়।

বিবাহের মূল অনুষ্ঠান ঃ

সম্প্রদাতার আসনে উপবেশন — আচমন ৩ বার নমঃ বিষ্ণু (ব্রাহ্মণ হলে ওঁ বিষ্ণু মন্ত্রে ৩ বার)

হাত জোড় করে বলবেন — নমঃ তদবিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। নম অপবিত্রো পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থান গতোহপি বা যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তর শুচিঃ। নম পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ। ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপোহরোহরিঃ।

হাতে গন্ধপুষ্প নিয়ে — এতে গন্ধপুষ্পে নম গঙ্গায়ৈ নম, বলে ফুল সামনে রাখা তাম্রকুন্ডে রাখুন।

সূর্য স্মরণ — দূর্বা, আতপচাল, চন্দন, ফুল, জল কুশীতে নিয়ে বলবেন - নমো এহি সূর্য সহস্রাংশো তেজরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহানার্ঘং দিবাকরম। এযোঅর্ঘং নম কাশ্যপ গোত্রায় ছায়া সংজ্ঞা সহিতায় শ্রী সূর্য ভট্টরকায় নম। জলশুদ্ধ কুশী মাথায় ঠেকিয়ে তাম্রকুন্ডে ফেলবেন।

হাত জোড় করে — নম জবাকুসুম সঙ্কাশ্যমং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধান্তারিং সর্ব পাপঘ্ন প্রণহোতস্মি দিবাকরম।

ফুল নিয়ে - এতে গন্ধেপুষ্পে নমঃ শ্রী গুরবে নমঃ, পাত্রে রাখুন।

হাত জোড় করে - ওঁ অখন্ডমন্ডলাকারং ব্যপ্তং যেন চরাচরম। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর। গুরু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।

গণেশ পূজা ঃ ফুল নিয়ে - এতে গন্ধেপুষ্পে নমঃ গণেশায় নম।

হাত জোড় করে - নমঃ সর্ব বিঘ্নবিনাশায় সর্ব্বকল্যাণহেতবে
পার্ব্বতী প্রিয়পুত্রায় গণেশায় নমো নমঃ।

নারায়ণ পূজা ঃ ফুল নিয়ে - এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ নারায়ণায় নমঃ

হাত জোড় করে - নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

শিবের পূজা ঃ ফুল নিয়ে - এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ শিবায় নমঃ

হাত জোড় করে — নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং তাং গতি পরমেশ্বর।

দুর্গার পূজা ঃ ফুল নিয়ে - এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ দুর্গায়ৈ নমঃ

হাত জোড় করে - নম শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্ব্বস্যার্তি হরে দেবী নারায়ণী নমোস্তুতে।

এরপর নানা দেবদেবীর পূজা

ফুল নিয়ে — এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সর্ব্বেভ্য দেবেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ মাতৃচরণেভ্যো নমঃ।

বর আবাহন — বরাসনে বসিয়ে সম্প্রদাতা বলবেন -- সাধু ভবানাস্তাম

বর ঃ নম সার্ব্বহমাসো

সম্প্রদাতা ঃ অর্চ্চয়য্যামো ভবন্তম।

বর ঃ নমো অর্চ্চয়। এরপর গন্ধ, পুষ্প, মালা, জোড়দান থালায় নিয়ে।

সম্প্রদাতা ঃ একটি থালায় সব উপকরণ সাজিয়ে রাখতে হবে ডানহাতে দুর্বা আতপচাল নিয়ে বরের ডানহাঁটু ছুঁয়ে বলবেন —

শ্রীবিষ্ণুর্নামোতৎসৎঅদ্য অমুক মাসে অমুকরাশিস্থে ভাস্করে — পক্ষে — তিথৌ — গোত্রস্য — (সম্প্রদাতার নাম) দাস্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ — গোত্রস্য কাশ্যপ অপসার নৈধ্রুব প্রবরস্য শ্রী — (ঠাকুরদার নাম) দাসস্য পৌত্রাম — গোত্রস্য কাশ্যপ অপসার নৈধ্রুব প্রবরং শ্রী — (পিতার নাম) দাসস্য পুত্রম — গোত্রস্য কাশ্যপ অপসার নৈধ্রুর প্রবরাং শ্রী — (পাত্রের নাম) দাসম, অমুক গোত্রস্য ঔর্ধ্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্যা, প্লুবতঃ প্রবরস শ্রী — (ঠাকুরদার নাম) দাসস্য পৌত্রীম — গোত্রস্য ওর্ধ্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্যা প্লুবত শ্রী — (পিতার নাম) দাসস্য পুত্রীম অমুক গোত্রাম ঔর্ধ্ব, চ্যবণ, ভার্গব, জামদগ্ন্যাপ্লুবতঃ প্রবরাং শ্রীমতি — (কন্যার নাম) দাস্যা ভিধানাং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুমেভিঃ পাদ্যেগন্ধাদিভিরভর্চ্চ্যত্বে ভবন্তমহং বৃণে।

বর - নমঃ বৃতোহস্মি।
সম্প্রদাতা - নমঃ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু।
বর - নম যথাজ্ঞানং করবাণি।
সম্প্রদাতা - আসন দেখিয়ে নমো আসনো প্রতিগৃহ্যতাম
বর — নমো আসনং প্রতিগৃহ্নামি।
সম্প্রদাতা — পাদ্য (জল) কুশীতে নিয়ে নমো পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম
বর জল মাটিতে রেখে দু'পায়ে ছিটিয়ে — নমো পাদ্যং প্রতিগৃহ্নামি।
সম্প্রদাতা ফুল দুর্বা নিয়ে — নমো অর্ঘ্য প্রতিগৃহ্যতাম
বর — নমো অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি।
সম্প্রদাতা কুশীতে জল নিয়ে — নমো আচমনীয়ম প্রতিগৃহ্যতাম
বর মুখে জলের ছিটে দিয়ে নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু, নমো বিষ্ণু বলে আচমনীয়ম প্রতিগৃহ্নামি। নমঃ আ মা গণং যশসা সংসৃজবর্চ্চসা তং মা কুরু প্রিয় প্রজানাম অধিপতিং পশূনাম অরিষ্টং তনূনাম।
কাঁসার পাত্রে মধুপর্ক (মধু, ঘি, দই, দুধ, চিনি) বরকে দান করবেন
সম্প্রদাতা — নমো মধুপর্ক প্রতিগৃহ্যতাং।
বর — নমো মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি।

ওঁ মধুবাতা ঋতয়তে মধুক্ষরন্তি সিন্দভঃ
মাধ্বীন সন্তোষকীঃ।
ওঁ মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজ
মধু দৌরস্ত নং পিতা।
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নং।

এরপর হবে স্ত্রী আচার, মালাবদলের পালা যেখানে কোন মন্ত্র নেই। শেষ হলে বর কনে মুখোমুখি বসবে দুটি পিঁড়িতে।। সম্প্রদাতা বর কন্যার মুখাবলোকন করাবেন।
সম্প্রদাতা — নমো সমীভবেথাম।
বর — নমো সমজন্তু বিশ্বদেবা সমাপো হৃদয়ামি নৌ। সস্মাতরিশ্বা সমুদ্রেষ্ট্রিনৌ।

এরপর ফুলের মালা দিয়ে দু'জনের ডানহাত বন্ধন। বরের ডানহাতের উপরে কনের ডানহাত। তার উপর গাঁটছড়া, গামছা আচ্ছাদন। উভয়ের হাতে আতর চন্দন দিবেন সম্প্রদাতা বাঁ হাত মাটিতে ঠেকিয়ে বলবেন —

নম এতস্মৈ সাচ্ছাদনাসাঅলঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ। ফুল নিয়ে — এতে গন্ধপুষ্পে এতদ অধিপতয়ে নম প্রজাপতয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় বরায় নমঃ।
সম্প্রদাতা কুশ, হরিতকী ধরে বলবেন —

শ্রীবিষ্ণুর্নামোতৎসৎঅদ্য অমুক মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ অমুক দাসঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অপসার নৈধ্রুব পবরস্য অমুক দাসস্য পৌত্রায় অমুক গোত্রস্য অমুক অপসার নৈধ্রুব প্রবরস্য অমুক পুত্রায়, অমুক গোত্রায় অমুক অপসার নৈধ্রুব প্রবরায় অমুক দাসায় বরায় অর্চ্চিতায় অমুক গোত্রস ঔর্ধ্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্যাপ্লুবতঃ প্রবরস্য অমুক দাসস্য পৌত্রীম অমুক গোত্রস্য ঔর্ধ্ব, চ্যবর্ন, ভার্গব, জামদগ্ন্যা, প্লুবতঃ প্রবরস্য অমুক দাসস্য পুত্রীম অমুক গোত্রাং ঔর্ধ্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্যাপ্লুবতঃ প্রবরাং অমুক দাস্যা ভিধানাং অলঙ্কৃতাং বাসুযগ্মাচ্ছাদিতাং প্রজাপতি দেবতাকাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।
বর ও কনের হাতে কুশ ও জল দিবেন।
বর — নমো বিষ্ণুঃ
সম্প্রদাতা — কন্যেয়ং প্রজাপতির্দৈবতাকা।
এরপর ব্রাহ্মণ গাঁটছড়া বেঁধে দেবে। বর কনে হাতের আঘ্রান নেবে। পুরোহিত গায়ত্রী পাঠ করবেন।

দক্ষিণান্ত ঃ সম্প্রদাতা তিল, কুশ, ফুল, টাকা কোশার মধ্যে নিয়ে বলবেন

শ্রীবিষ্ণুর্নামোতৎসৎঅদ্য অমুক মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দাসঃ মহাভারতোক্ত ফলপ্রাপ্তি কামনয়া কৃতৈতৎ শুভকন্যা সম্প্রদানকর্ম সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং তদনুকল্পয়দ্দেয়ং তদবরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

বর — নম স্বস্তি বলে গ্রহণ করবে।

সম্প্রদাতা —

নম কৃতৈতৎ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মঅচ্ছিদ্রমস্তু।

বৈগুণ্যসমাধান — শ্রীবিষ্ণুর্নামোতৎসৎঅদ্য অমুক মাসে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র অমুক দাসঃ কৃতেহস্মিন শুভকন্যাসম্প্রদান কর্ম্মনি যদবৈগুণ্যজাতঃ তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে

এরপর দশবার শ্রী বিষ্ণু জপ করবেন সম্প্রদাতা।

অচ্ছিদ্রাবধারণ — এক গন্ডুষ জল নিয়ে বলবেন

নমঃ অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধবরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদবিষ্ণোঃ সম্পূর্ণঃ স্যাৎ ইতি শ্রুতি। নম যদ সাঙ্গং কৃতং কর্ম্মং জানতা বাপ্য জানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরেনামানুকীর্তনাৎ। শ্রী হরি শ্রী হরি শ্রী হরি বলে জল ফেলবেন তাম্রকুন্ডে।

এবার সম্প্রদাতা ও বর দু'জনেই এক গন্ডুষ করে জল নিয়ে বলবেন —

নমো প্রীয়তাং পুন্ডরীকাক্ষং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরি। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়র্পিতমস্তু। জল ফেলবেন তাম্রকুন্ডে।

সম্প্রদাতা হাত জোড় করে বলবেন — নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ।

এরপর লাজহোম —

তিনমুঠো খই ঘি মাখিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করতে হবে

পুরোহিত বলবেন — ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা

অগ্নিপ্রজ্জ্বলন করবেন —

পরে নিজ নিজ আসনে বসে হাতজোড় করে —

নম চর্তুবদনসিমস্থ চতুর্ব্বেদ কুটুম্বিনে

দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রাহ্মণে নমঃ।

নম তমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরর্সি পাবকঃ। হব্যংবহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে। নম পিঙ্গাক্ষ্য লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন সাক্ষিত্বং পুণ্যপাপানং ধনঞ্জয় নমোহস্ততে।

এরপর অগ্নি প্রদক্ষিণ ও সাত পা একসাথে গমন —

সিন্দুর দান — নোয়া চুড়ি পরানো। কুনকেতে করে বরের সিঁদুর দান।

পুরোহিতের গায়ত্রী পাঠ।

অগ্নিনির্বাপণ — জল দিয়ে নমঃ অগ্নেত্বং সমুদ্রং গচ্ছ

ঈশান কোণে দই দিয়ে নমঃ পৃথ্বিত্বং শীতলা ভব।

বর কনের ডানকাঁধ বেষ্টন করে বলবে —

ওঁ মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু

মমচিত্তম অনুচিত্তং তে অস্তু।

মম বাচনেকমনা জুষস্ব প্রজাপতিস্তা নিজনুক্ত মহ্যম।

ওঁ যদেতদ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

বরের দক্ষিণান্ত — কোশায় কুশ হরিতকী মুদ্রা ডানহাতে ধরে বর বলবেন —

শ্রীবিষ্ণুর্নামোতৎসৎঅদ্য অমুক মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য অমুক দাসঃ মদীয় শুভবিবাহ কর্ম্ম সাঙ্গতার্থং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং অনুকল্পং রৌপ্যখন্ডং হরিতকী ফলং বা যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণাং অহং সম্প্রদদে বলে ব্রাহ্মণের হাতে দেবেন।

ব্রাহ্মণ — ওঁ স্বস্তি।

অচ্ছিদ্রাবধারণ — দশবার শ্রী বিষ্ণু জপ

প্রণাম — বর করবে - নমঃ অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধবরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদবিষ্ণোঃ সম্পূর্ণঃ স্যাৎ ইতি শ্রুতি। নম যদ সাঙ্গং কৃতং কর্ম্মং জানতা বাপ্য জানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরেনামানুকীর্তনাৎ। শ্রী হরি শ্রী হরি শ্রী হরি।

বর হাতে জল নিয়ে বলবে —

নমো প্রীয়তাং পুন্ডরীকাক্ষং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরি। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়র্পিতমস্তু। জল ফেলবেন। হাত জোড় করে — নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ।

শান্তিজল — ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাং। বাসুদেবো জগন্মাহস্থ থা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু

বিজয়ায়তে। আখন্ডলোহ গ্নিভিগবান্ যমো বৈ নৈঋর্তস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্ত তে সদা।। ওঁ কীর্ত্তিলক্ষ্মী ধৃতিমেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধাক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চমাতরঃ। এতাস্তামভিষিকন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ।। ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌম বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্তামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চতর্পিতাঃ। ওঁ ঋষয়ো মনুয়ো গাবো দেবমাতর এবচ দেবপত্ন্যা ধ্রুবানাগা দৈত্যশ্চা প্সর সংগণাঃ অস্ত্রাণি সর্ব্বসস্ত্রাণি রাজানো বাহনানিচ। ঔষধানিচ রত্নানি কালস্যবয়বাশ্চয়ে। ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদানদাঃ। দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। এতে স্তামভি ষিঞ্চন্তু ধর্ম্মাকামার্থ সিদ্ধয়ে।।

ওঁ সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বেসন্তু নিরাময়া
সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখ ভাগভবেত
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি ওঁ শান্তিঃ

আশীর্বাদ (বর ও কনের আলাদাভাবে করতে হয়)

সমস্ত মন্ত্রই পুরোহিত বলবেন। আশীর্বাদ কর্তা নমঃ নমঃ নমঃ বলবেন।

আচমন শ্রীবিষ্ণুস্মরণ, শ্রীগুরুস্মরণ এরপর

চন্দন দিয়ে নমঃ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষং নিত্যপুষ্টাং করীষিনীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপ হবয়ে শ্রিয়ম্।

ধান দিয়ে ধান্য মহি ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং।
ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।।

দূর্বা দিয়ে কান্ডাৎ কান্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষঃ পরি।
এবং নো দুর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।

আশীর্বাদকারী বর ও কনের মাথায় হাত দিয়ে বলবেন

সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ দুঃখভাগভবেৎ।

'জেলার খবর সমীক্ষা'র গ্রাহক হন
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬০ টাকা
লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে।
পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।
যোগাযোগ করুন -- সম্পাদকীয় দপ্তরে,
গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।
ফোন - ৯৮০০২৮৬১৪৮

সাদিকে বিশ সাল বাদ

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

পেরিয়ে বিয়ের বিশ বছর
দিনে মারি মাছি, রাতে মচ্ছর
ওর চোখে আজ আমি নচ্ছর
ছুঁচো-পাজি, বুড়ো-ভাম!-
হায়-হায়, রাম-রাম!

সারারাত পাশ ফিরে শুয়ে থাকে
ঘড়-ঘড়-ঘড় জোরে নাক ডাকে
মনে হয়, ঘুষি মেরে দিই নাকে
হয় হোক বদনাম!
হায়-হায়, রাম-রাম!

ভুলেছে আদর, দিতে কিস-টিস
কানের কাছেতে করি ফিসফিস
সব আবদারই হয় ডিসমিস
বলে, মিনসের ঢং!
যদিদং হৃদয়ং!

পিরিতির রঙ গেছে সবই চ'টে
সেই রস আর নেই বুকে-ঠোঁটে
কথায়-কথায় খেঁকিয়ে সে ওঠে
প্রেমেতে ধরেছে জং!
যদিদং হৃদয়ং!

ঘরে ফিরলেই জামা দ্যাখে শুঁকে
অচেনা চিহ্ন খোঁজে ঝুঁকে-ঝুঁকে
পেলে খুঁজে খুঁত, ঝড় তোলে মুখে
দেয় ফেলে শোরগোল
বলো হরি, হরিবোল।

নেই কাজ কিছু
খাওয়া-শোওয়া ছাড়া
আর মাঝেমাঝে জোরে মুখ নাড়া
মেদের পাহাড় করে তাকে তাড়া
ফুলে-ফেঁপে দেহ ঢোল!
বলো হরি, হরিবোল!

সব শেষ হলো এতো বেলাবেলি
তাই হার মেনে রাগে বলে ফেলি
চলো, এক-হাত লুডোটাই খেলি
চাল তুমি আগে দিও!
প্রেম যুগ-যুগ-জিও!

আসল কথাটা যাক শেষে বলা
থাক না জীবনে যত ছলাকলা
ওকে বাদ দিয়ে একা পথ চলা
ভাবনা অভাবনীয়
প্রেম যুগ-যুগ-জিও!

বি বা হ বা র্তা

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

ভয়াবহ বিবাহ শব্দের নিরীহ অর্থ হল বধূকে বিশেষভাবে বহন করা। বধূবহন। ভারবাহীকে যাতে বেশি ভার নিতে না হয় তাই মনুর বিধানে বলিষ্ঠ ৩০ বছরের যুবক ১০/১২ বছরের বা ২৪ বছরের যুবক ৮ বছরের ছোট্ট কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ৮ বছর। ৮ বছরের গৌরী দান।

অষ্ঠবর্ষা ভবেদ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী
দশমে কন্যাকে প্রোক্তা ততো উর্দ্ধং রজস্বলা।

আট বছরের পাত্রীকে বলে গৌরী, নয় বছরের রোহিণী আর দশ বছরের পাত্রী হল কন্যকা। এখন আর এমনটি হয় না, যা হয় তাতে স্বামী নামক আসামীর শাস্তি। বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন — পূর্বজন্মের পাপের জন্য পুরুষদের প্রায়শ্চিত্ত বিশেষকে বিবাহ বলে। বর্বর অসভ্য যুগের শেষে সভ্যতার শুরু থেকে বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন। বিবাহ হল একজন পুরুষ ও একজন নারীর আনুষ্ঠানিক ভাবে দেহ ও মনের সমাজ স্বীকৃত মিলন। আনুষ্ঠানিক ও সামাজিক স্বীকৃতি থাকায় এক বিবাহিতা নারী অপর পুরুষের সঙ্গে এবং এক বিবাহিত ব্যক্তি অপর নারীর সঙ্গে সামাজিক ভাবে স্বামী সম্পর্ক রাখতে পারে না। সভ্য সমাজ ও সংস্কৃতি তেমনটিই বলে থাকত। অবশ্য অতীতে এদেশে দেখা গেছে এক পুরুষের অনেক বিবাহিতা স্ত্রী আছে আবার তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, উত্তর পূর্ব ভারতে এক নারীর একাধিক বিবাহিত স্বামী আছে। একাধিক হলেও বিবাহিত অর্থাৎ সামাজিক ভাবে স্বীকৃত। দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামী। জটিলা সাত ঋষিকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মী নামক ঋষি কন্যা প্রচেতা বংশের দশভাইকে বিবাহ করেন।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিকে ও নীতি অপেক্ষা আইনকে সম্বল করে সে রীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তাতে মানুষ সমাজ অপেক্ষা নিজের বিবেচনাকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে; তাই এখন কেবল নারী ও পুরুষের বিবাহ না হয়ে এক পুরুষ আর এক পুরুষকে বা এক নারী অপর নারীকে বিবাহ করতে পারে; বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রাখতে পারে কারণ সে স্বাধীন, তার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। এ যুগে সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তি বড়। এবং অন্য দেশে তা আইনতঃ স্বীকৃত। আধুনিক যুগে ধর্ম চলে না রাজনীতি চলে যার মধ্যে সততা, নৈতিকতা থাকার প্রয়োজন নেই।

হিন্দুর দশকর্ম সংস্কারের অন্তিমটি হল বিবাহ। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, অনুশাসনের সমাবর্তন ও বিবাহ। সমগ্র জীবনটাই চলত সামাজিক অনুশাসনের মধ্য দিয়ে। ধর্ম, বিশেষ হিন্দুধর্ম নির্বাসিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশ থেকে ঐ দশকর্মের অন্তিম দশা ঘটেছে, বিবাহের নিয়মকানুনও ঘুচেছে। এখন বিবাহ আর ''পুত্রার্থে ক্রিয়থে ভার্যা'' নয় ''কামার্থে ক্রিয়তে ভার্যা''। পিতৃঋণ শোধ করতে পুত্র বিবাহ করত, নিজের কাম চরিতার্থ করতে নয়। এখন যুবক যুবতীর মনপসন্দ হলেই এক সঙ্গে থাকা; অস্থায়ী হলে আইন স্বীকৃত 'লিভ টুগেদার' আর স্থায়ী হলে বিবাহ।

মনু সংহিতায় এক সময় এ দেশে আট রকম বিবাহ ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্ম (ব্রাহ্মণ), দৈব, আর্য, প্রাজাপাত্য, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ। এরপর অনুলোম ও বিলোম ব্যবস্থা। উচ্চ বর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করলে অনুলোম আর উচ্চ বর্ণের নারীর সঙ্গে নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ বিলোম।

সব কিছুর সরলীকরণ চাই, বিবাহের ব্যাপারেও। এখন আর বর্ণ, গোত্র, প্রবর, মেল, কাপ, সপিন্ড ইত্যাদি বিচারের বালাই নেই তবে দুটি বর্ণে নজর থাকে তা হল গাত্রবর্ণ ও স্বর্ণবর্ণ। মন চাহিলেই বিবাহ, যদিও মনের মিল কদাচ হয়ে তাকে।

সপিন্ড, সেবা আবার কি? পিন্ড বা পিন্ডি কথাটা আজও

শোনা যায়। জীবিত বাপ-মা কে যে ছেলে খেতে পরতে দেয় না, সেও মৃত বাপ-মার উদ্দেশে পিন্ড দান করে থাকে। সপিন্ড অবশ্য সে পিন্ড নয়। পিন্ড কথার সহজ অর্থ দেহ বা দেহাংশ, যাকে সাহেবি ভাষায় জিন বলা হয়। একই জিনের পাত্র পাত্রীর বিবাহ হলে তাদের সন্তানের দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। তাই মায়ের দিকে পাঁচ পুরুষ আর বাপের দিকে সাত পুরুষের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ।

এ ব্যবস্থা কেবল গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যেই নয়। উন্নত সাহেবদের মধ্যেও এমন বিধিনিষেধ ছিল। ছিল খ্রিস্টানদের মধ্যেও তাদের ইংরেজি ভাষায় বলা হয় প্রোহিবিটেড ডিগ্রি অর্থাৎ যাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ। এই প্রোহিবিটেড ডিগ্রি বা নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে থাকবে কারা? তার তালিকা নিম্নরূপ।

পুরুষ তার ঠাকুমা, পিসী, মাসী, কাকী, মামী, শ্বশুরের বোন, শাশুড়ির বোন, মা, শাশুড়ি, মেয়ে, পুত্রবধূ বোন, ভায়ের বৌ, নাতনি, ভাগ্নী, মেয়ের ছেলের বৌ, বা ছেলের ছেলের বৌ, বৌ এবং ভায়ের মেয়ে, ভাইঝি — এমন সব সম্পর্কের কোন মহিলাকে বিবাহ করবে না, অনুরূপ ভাবে কোন মহিলাও ঐ সম্পর্কীয় কোনও পুরুষকে বিবাহ করবে না; কারণ নিষিদ্ধ সম্পর্ক।

ভারতের নানা প্রদেশে বিবাহ বৈচিত্র্য আছে। যেমন মিথিলায় বরের হাট বসত, পাত্রীপক্ষ পণ দিয়ে পাত্র নির্বাচন করত। বিহারে, উত্তরপ্রদেশে বিধবার বিবাহ হত নাম তার সাগাই, খরাও, সাজা করেওরা। বৌ যদি দেবরকে বিয়ে করে তার নাম 'দেবরণ' আর স্বামী যদি বৌয়ের বোন, শ্যালিকাকে বিয়ে করে তবে তা হবে 'শালীবরণ'। বৌদ্ধ অধুষ্যিত চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লায় বৌদ্ধদের দু'রকম বিয়ে। কনে যদি বিয়ে করতে বরের বাড়িতে আসে তবে নামন্ত আর বর যদি কনের বাড়িতে আসে তবে তাকে বলে চলন্ত।

এখন বিশ্বের সব দেশেই, যারা নিজেদের সভ্য দাবি করে তারা আর সামাজিত নিয়মনীতি মানে না, বিবাহের আন্তর্জাতিকরণ ঘটেছে। এক পুরুষ ও এক নারী ইচ্ছা করলেই বিয়ে করতে পারে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সপিন্ড, ডিগ্রি কিছুই মানবার প্রয়োজন নেই। যেমন নেই পশুরাজ্যে, তারা সবাই স্বাধীন।

প ণ্য না প ণ

মালতী দাস

নয়কো অনেক কন্যা আমার
একটি কন্যা মাত্র
কন্যাগ্রস্ত করার জন্য
খুঁজছি সুপাত্র
পণ দেব না এমন পণ
মোটেই আমার নেই
পাত্র হবে গুণিজন
চাই যে শুধু এই।
এমন পাত্র পেলে দেব
ভরি বিশেক সোনা
নমস্কারী দেব এমন
যাবে নাকো গোনা

খাট বিছানা টিভি ফ্রিজ
শো কেস ও আলমারী
সঙ্গে দেব যোগ করে
একটি মোটরগাড়ি।
আর যা আছে দেওয়ার তাহা
দেব হিসেব করে
শর্ত শুধু বরবাবাজী
যেন আসে স্বর্ণ রথে চড়ে
বিয়ের পরে বরের মাথা
নত থাকে যেন লাজে
বিয়ের পরে থাকতে হবে
মেয়ের সর্ব সেবার কাজে
শর্ত মতো পাত্র পেলে
এনো আমার কাছে
আনবে যে তার পাওনা তো ভাই
সবার আগেই আছে।

বিয়ের গান

ডঃ সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ আনন্দে গান গায়। বিয়ে একটা আনন্দঘন ব্যাপার — এই আনন্দে মানুষ গান করে। আপাতভাবে এমন একটি সরল সমীকরণ হাজির করলেও, বিয়ের গান আদতে বেশ জমকালো এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। গানে যেমন আনন্দ থাকে দুঃখ থাকে, থাকে আরও নানাবিধ আবেগের বহিঃপ্রকাশ — বিয়ের গানও তার ব্যতিক্রম নয়। তার চেয়ে বড় কথা বিয়ের গান আমাদের নানা বিষয়ে অবহিত করে। এই অবহিত করণের বিষয়টি এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হয়। বাঙালী হিন্দু - মুসলমান উভয় সমাজে বিয়ের গান শোনা যায়।

বিবাহে 'স্ত্রী আচারের মন্ত্র' রূপে বিবাহ সঙ্গীতকে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে — 'বিবাহের প্রস্তাবনা থেকে শুরু করে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রত্যেক স্ত্রী-আচারেই বিষয়ানুরূপ সঙ্গীত গীত ýûþõÊü ÛÊÈÂ¸õõ±ý ü/ Ïî Âõù±ýÊüþï ±ÊÈÂ¾'[১] প্রখ্যাত সংগীতবেত্তা দিনেন্দ্র চৌধুরী লিখেছিলেন, যে বিবাহ সংগীত মূলত গ্রামীণ, নগর কেন্দ্রিক জীবনে এর কোন স্থান নেই। গ্রামবাংলায় বিবাহ সঙ্গীত সূচনা থেকে সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত নানা স্তরে বিভক্ত — দিনেন্দ্রবাবু লিখেছেন। এবিষয়ে তাঁর সংযোজন ঃ প্রস্তাবনা, লগ্নপত্র, পাকাদেখা, পাটিপত্র বা মঙ্গলাচরণ, পানখিলি, জলবয়া, ধামাইল, সোহাগ মাঙ্গা, গায়ে হলুদ, অধিবাস, দধিমঙ্গল, নান্দীমুখ, সাতপাক, ভাতকাপড়, পাশাখেলা, কড়িখেলা, বাসি বিয়া, কন্যা বিদায়, বধূবরণ, ফুলশয্যা পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত।[২] এত বিস্তারিত আকারে না হলেও বিবাহে গানের প্রচলন এখনও কমবেশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে দেখা যায়। হিন্দু -মুসলমান সমাজ তো বটেই, রাজবংশী, আদিবাসী সাঁওতাল প্রভৃতি সমাজেও-এর প্রচলন রয়েছে। বিবাহে দু'ধরনের আচারের প্রাধান্য দেখা যায় — শাস্ত্রীয় ও লৌকিক। বিয়ের গান লৌকিক আচারের অঙ্গ। এ হল মৌখিক সৃষ্টি; লোকাচার পরম্পরায় শ্রুতি ও স্মৃতিতে তা বেঁচে থাকে। এর ধারক ও বাহক হল নারীকুল। মেয়েরাই বিয়ের গান করে থাকে। অল্প বয়েসী, বেশী বয়েসী, সধবা-বিধবা সমস্ত রমনীরই বিয়ের গান করার অধিকার রয়েছে। বিয়ের গানের রীতি অতি প্রাচীন। ঋক্‌বেদের যুগ থেকেই এর প্রচলন বলে মনে করা হয়। অশোকের অনুশাসনে, বানভট্টের হর্ষচরিতে বিয়ের গানের প্রসঙ্গ রয়েছে। মুসলমান সমাজে বিয়ের গানের রীতি অতি পুরাতন। হাদিসে আছে একবার হজরত আয়েশা (রাঃ) এক আনসারী সাহাবীর সঙ্গে তার এক বান্ধবীর বিবাহ দিচ্ছিলেন। তখন প্রিয় নবী বলেন তোমাদের কাছে কি উৎসবের কোন সরঞ্জাম নেই। আনসাররা তো গান পছন্দ করেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন বিয়েতে গানের সঙ্গে 'দফ' বাজালে ক্ষতি নেই। হাদিস থেকে জানা যায়, বিয়েতে গানের ক্ষেত্রে রুকসাত (ছাড় বা অনুমতি) রয়েছে।[৩]

পূর্বেই বলেছি, বিয়ের গান বিয়ের নানা পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন গায়ে হলুদের সময় মুসলমান সমাজে এই গান শোনা যায় —

আরম্ভ করিনু আমি বলিয়া বিসমিল্লা
খুশাহালে সাবেক দিলে সবে বল আল্লা।
'গায়ে হলুদ' নাম রাখিব হেলা পালার
বিয়ের রীতি বিয়ের নীতি গাতে সমাহার।[৪]

উত্তরবঙ্গের মেয়েলিগীতে হলুদ মাখানোর গান শোনা যায় —

হলদি উপায় কনের মা নিধুয়া পাথারে
হলদি শুকায় কনের মা নিধুয়া পাথারে।[৫]

এখানে বাঘ ও হরিণের ডাক কনের মা শোনেন; বিয়েতে মেয়ের শুভ কামনায় এদের দোয়া প্রার্থনা করেন কনের মা। গায়ে হলুদের গানে অনেক সময় বিবাহের তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। বরের বাড়ি থেকে কনেকে কী কী পাঠানো হয়েছে, গানে গানে

তাই বিধৃত করা হয়। হলুদ মাখানোর গান বর কনে উভয়েরই বাড়িতেই হয়। মুসলমান সমাজে এমন একটি গান —

ওরে আমার ভায়ের বিয়ে তোরা হলুদ মাখিয়ে দে
তোরা তেল মাখিয়ে দে।
আমার ভাই-এর গায়ে মাজায় হলুদ মাখিয়ে দে।
হলুদ মেখে ভাইধন যাবে আল্লা রসুলের বাড়ি।
রসুলের দেশে আনয়ে ভাইধন রূপসি সুন্দরি।[৬]

হলুদ মাখানো কেবল কোন একটি সমাজের নয়, একাধিক সমাজেই পালিত হয়। হলুদের দ্বারা শুদ্ধ করার উদ্দেশ্য তো থাকেই, সেই সঙ্গে হলুদ জীবানুনাশকও বটে। চর্মরোগ বা ত্বকের নানা সমস্যার সমাধানে হলুদের ব্যবহার দীর্ঘদিনের। বিবাহের ক্ষেত্রে হলুদের এমন সার্বজনীন ব্যবহারের একটি ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস করি।

'বিবাহ' আসলে বিশেষ রূপে বহন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে এই বিশেষরূপে বহন হল ভরন-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ। কিন্তু বিবাহের কাঠামোগত ও প্রতীকী আচার লোকাচারের ধরণ একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় বিবাহের মধ্যে একটা বিরোধিতা — একটা লড়াই যুদ্ধের ব্যাপার আছে। বিবাহের নিয়মকানুন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর থেকে জোর করে মেয়ে হরণ করে নিয়ে বিয়ে করতো। প্রতিরোধ লড়াই এর পর হয়তো সন্ধি স্থাপিত হতো। প্রতিটি সমাজেই মেয়েদের রক্ষা করার বা মেয়েদের সতীত্ব ইত্যাদির উপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই মেয়ে অন্য কারুর হাতে চলে যাক, সহজ ভাবে কোন সমাজ এটা চায় নি। তাই প্রাথমিক প্রতিরোধের একটা আভাস বিয়ের আচার আচারণের মধ্যে থেকে যায়। বরপক্ষ কন্যাপক্ষের মধ্যে তুলনা — নানা প্রতিযোগিতা মূলক খেলা এই বিরোধিতাকেই প্রতীকায়িত করে। লড়াই সংগ্রামে দেহে আঘাতের সম্ভবনা থেকে যায়। ওষধিগুণ সম্পন্ন হলুদের প্রলেপন কি সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে।

বন্দরে শহরে সোনার পালঙ্কী —
কী শিমটিয়া বাইসনের ফুল।
মাহির যে শ্বশুর লাগে বাবার চরণ
মিলিল বে মিলিল শ্বশুর উঠুয়া কুকুর।
সাহির যে দেওরা লাগে
ভাইয়ের মতন
মিলিল তে মিলিল দেওরা
ঘর সন্দা কুকুর।
মাহির যে শ্বাশুড়ি লাগে মায়ের মতন
মিলিল তে মিলিল শ্বাশুড়ি
খেন্দেরী কুকুর।

(অনুবাদ ঃ কনে সোনার পালঙ্কে বসে অপেক্ষা করছে। এদিকে বরযাত্রী এলে দেখা গেল হতভাগিনী কনেটির শ্বশুর দেবর, শ্বাশুড়ি — এরা কেউই কনের সুকোমল আচার আচরণের সঙ্গে মানান সই নয়। বরং প্রত্যেকেই তারা বিপরীত চরিত্রের। õù±Î ûË Âé±ËôpÅÂËôp÷Ë Â¼)

শুধু রাজবংশী সমাজেই নয়, মুসলমান সমাজেও আপাত মজার আড়ালে বোধ হয়, অতীতের সামাজিক ইতিহাসের আভাস ধরা পড়ে।

বরের বড় ভাই সেজো এলো — উমরো ঝুমরো।
অকে তাড়ো তাড়ো।
বরের মেজোভাই, সেজো এলো — কুকড়া শুকড়া।
অকে খ্যাদড়া খ্যাদড়া।[৮]

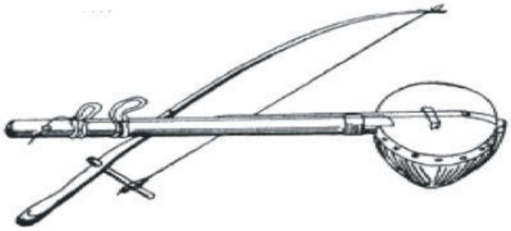

তথ্যসূচী ঃ ১. বিবাহগীতি — সুভাষ মিস্ত্রী, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমী অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪ পৃ. ১৬৯ ।। ২. বিবাহ সঙ্গীত - দিনেন্দ্র চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি কোষ, অপর্না বুক ডিস্টিবিউটার্স, কোলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮৫ - ২৮৬।। ৩. মুসলিম বিয়ের গানে বাঙ্গালী সমাজ - মানোয়ারা খাতুন, হরফ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪ পৃ. ২১ ।। ৪ ঐ।। ৫. উত্তরবঙ্গের মেয়েলি গীত - উল্লিখিত — প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬ ।। ৬. মুসলিম বিয়ের গানে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ - ঐ , পৃ. ১০৪।। ৭. রাজবংশী বিবাহগীতি - প্রেমানন্দ রায়, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা ২০১২, পৃ. ১৪।। ৮. মুসলিম বিয়ের গানে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ - ঐ পৃ. ১৮৫

আমাদের সমাজের বিয়ের গানের নমুনা

শ্যামল বেরা

পরিবার গঠনের মূলে যে বিবাহ, তা আমাদের সমাজ প্রগতির এক চূড়ান্ত পর্যায়। বহুবর্ণে, বহু গোষ্ঠীতে বিভিন্ন হলেও আমাদের জীবনযাপনের আশা স্বপ্নের মৌল চাহিদা এবং প্রকাশ যে মূলত একই, তা আমাদের সমাজের বিয়ের গানগুলির পর্যালোচনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়। লোকমেধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই গানগুলি থেকে আমরা সমাজ জীবনের অপরূপ সব চালচিত্রের পরিচয় পাই। নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের দ্বারা সৃষ্ট এইসব গানগুলি, আমাদের সমাজ সত্যের উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট তাৎপর্যময়।

বিবাহের আচার প্রধানত দু'প্রকার। একটি শাস্ত্রীয়, অপরটি লৌকিক বা স্ত্রী আচার। স্ত্রী আচারের মধ্যে পড়ে বিয়ের গান। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক যথার্থই বলেছেন — 'লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করেই মৌখিক ভাবে এগুলি রচিত হয় এবং লোকসংগীতের বিশিষ্ট সুরেই তা গাওয়া হয়। এইজন্য বিয়ের গানকে লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলে মনে করা হয়।'

বিয়ের গানগুলি আমাদের সমাজ বিবর্তনের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গানগুলি মূলত স্ত্রী আচারের সঙ্গে যুক্ত। স্ত্রী আচারের মধ্যে রয়েছে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। মুসলমান সমাজে গায়ে হলুদ নিয়ে একটি গানে স্নিগ্ধ কৌতুক রসাশ্রিত এক অপূর্ব আনন্দঘন মুহূর্ত বড়ই মধুর ও শৈল্পিক সুষমার অভিব্যক্তি হয়েছে। গানটি এইরকম —

''হলুদ তেলের সুরুবুরু / হলুদ পড়েছে গায়েতে / হলুদ তেলের ভারে নওসালাল / নিজে ঢলে পড়েছে / মালিনী গো দাও না / জিরা ফুলের হামাল গেঁথে / নওসালালের গলাতে / হলুদ তেলের সুরুবুরু / হলুদ পড়েছে গায়েতে / হলুদ তেলেরে ভারে হাসিলাল / নিজে ঢলে পড়েছে / হলুদ আওলা মালিনী / বেল ফুলে মালা গেঁথে / হাসিলালের গলাতে।'

ছেলে বিয়ে করবে। তাই নিয়ে বড়দের চিন্তার শেষ নেই। ছেলে কোন বিপদে যাতে না পড়ে তাই নিয়ে বাৎসল্য রস মেদুর হয়েছে এই গানে —

'সরষারে সরষা, তোর জনম কোথা বল না / আমার জনম হলো চড়ার মাঠে / এসেছি আমি সাদির ঘরে / উঠেছি আমি আপনলালের শিরেতে / করাটেতে কাটোরে গুয়া / চালনিতে চালরে সরষা / আমার বাচ্ছাকে রাখ হেসে খুশে / দুষ্মনেতে না পড়ে।'

ছেলের মা ছেলের বিপদ-মুক্তির গান করে। কিন্তু মেয়ের মা যেন নিরুপায়। তার কন্যাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাতেই হবে। সাঁওতালী সমাজের একটি গানে মা ও মেয়ের অশ্রু সজল বেতনার্ত হৃদয়ের বাণী রূপ পেয়েছে এই গানে —

হুডিঞ্চ হুডিঞ্চ খনাং লকা লকাতেয়ু / ওহায়া আডি যতন তেয়ুম হারা লিদিঞ / দায়ামায়া আয়ো বাণুঃ তামা মাসে / ওহায়া আড়ি সাগিঞ বেয়ুম দিশম আদিঞ / আলম রাগা বিটি আলম উইহটর মাসে / ওহায়া কুড়ি হপন জনম এটাঃ অড়াঃ

গানটির ভাবার্থ — বিয়ের পর কন্যা তার মাকে বলছে, মা তুমি কত ছোট থেকে কোলে কাঁখে যত্ন করে বড় করে তুলেছো কিন্তু এখন সে সব ভুলে দয়ামায়াকে উপেক্ষা করে আমাকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছ। মা সান্ত্বনার সুরে বলছে - মা কেঁদো না, চিন্তা কোর না, মেয়ে জন্ম পরের বাড়ির শোভাবর্ধক।'

বিয়ের পর্ব কেটে গেলে বর কনেকে নিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে আসে, সঙ্গে আনে যৌতুকের জিনিষপত্র। এ নিয়েও গান বাঁধা হয়েছে। 'সাজো ফুলে গেলে ভাইজান / বাণীফুলে কেন এলে যে / তোমার শ্বশুর মিয়াঁ / কি কি দিলে দানে তে / গাই দিয়েছে, বাছুর দিয়েছে/ আমি পালে হেঁকে এনুন যে'

এই সব গান আজ ক্রমবিলীয়মান। এসব গান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজন।

তথ্যসূচী ঃ- মোসম্মদ পেয়ার জান বিবি (মেচোগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর), সরস্বতী মুর্মু (রাঙামাটির, থানা জামবনী, পশ্চিমমেদিনীপুর)।

বিয়ে নট আউট

প্রদীপ ভট্টাচার্য

মানুষসৃষ্ট যে সব সামাজিক প্রথা প্রাচীনকালে সৃষ্টি হয়ে আজ পর্যন্ত বেশ বহাল তবিয়তে টিকে আছে, বিবাহ প্রথা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এর মতো একটা কার্যকরী সামাজিক প্রথাও এখন আর খুব একটা দেখা যায় না। বিবাহ প্রথার উদ্ভব, ইতিহাস এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দিস্তা দিস্তা পাতা লেখা হয়েছে, সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য অনেক প্রথার মতো বিবাহ বা বিয়ের ব্যবস্থার বেশ একটা ধর্মীয় মোড়কের আচ্ছাদন রাখা হয়েছে। তার সত্যিই কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে টাইম পাশ করা যেতেই পারে। তর্ক চলতেই পারে আধুনিক সময়ে বিয়ের বদলে পাইকারি রেটে তথাকথিত 'লিভটুগেদার' প্রথা চালু হওয়া উচিত কি না তাই নিয়েও। কিন্তু দেখে শুনে মনে হয় না আগামী বেশ কিছু বছরে এই প্রথা বিলুপ্ত হবার কোন সম্ভাবনা আছে। বিয়ে ছিল, আছে এবং থাকবেও। যতদিন যাচ্ছে বিয়ের পরবর্তী সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু পাশাপাশি বিয়ের জৌলুশ, বিয়ে নিয়ে উৎসাহ এবং অনেকক্ষেত্রেই বিয়ে নিয়ে বেশ একটা দেখানপনাও রমরম করে বেড়ে চলেছে। 'বিয়ে করব না' জাতীয় ধনুকভাঙ্গা পণ করেও জীবনের কয়েকটা মূল্যবান বছরকে হেলায় উড়িয়ে দিয়েও শেষ পর্যন্ত একটু বেশী বয়সে পৌঁছেও সেই বিয়ের কাছেই নতজানু হওয়ার ঘটনা অতীতকাল থেকেই ট্রাডিশন বজায় রেখে আজও ঘটে চলেছে।

কিন্তু মজার বিষয় হলো, বিয়ের এহেন অপরিহার্যতা ও অনিবার্যতা সত্ত্বেও বিয়ে নিয়ে রঙ্গ, তামাসা ও চুটকি গল্পের বিরাম নেই এবং লক্ষ্যণীয় যে, সেগুলোর লক্ষ্যমুখ হলো বিয়ের কুফল নিয়ে। অর্থাৎ, এইসব চুটকি পড়লে বোঝা যায় যে, যারা এগুলোর জন্ম দিয়েছে, তারা বিয়ে করে আত্মগ্লানিতে ভুগছে এবং যারা এখনও এ হেন 'বিষময়' ব্যবস্থার মধ্যে সামিল হয়নি ভুক্তভোগী হিসাবে তাদের সতর্ক করে দেবার মহান দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অসহায় গেনুদার কথা। গণেশ চন্দ্র দাস আমার অফিসের সহকর্মী। আমি তখন সদ্য চাকরি করতে ঢোকা বছর পঁচিশের যুবক। আর এক সহকর্মীর বিয়ের অনুষ্ঠানে গেছি দলবেঁধে। গণেশদাকে ঘিরে তাঁর গুণমুগ্ধ আমাদের গণপতি ফ্যান। গল্পগুজবের মধ্যে গণেশদা, হঠাৎ কেমন যেন আনমণা হয়ে পড়লেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার গণুদা, আপনি হঠাৎ অফ্ হয়ে গেলেন কেন? গণুদা একটু বিষন্ন হয়ে বললেন, ''দ্যাখ্, দেখতে দেখতে দশটা বছর পার হয়ে গেলো; তখন যদি বিয়েটা না করতাম''। আমরা অবাক। দশ বছর আগে কি ঘটেছিল? তার সঙ্গে আপনার বিয়ের কি সম্পর্ক? গণুদা বললেন, ''দশ বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। তারও দু-চার বছর আগে থেকে তোদের বউদির সঙ্গে আমার একটু 'ইয়ে' ছিল আর কি! ওই কমবয়সে যা হয়, একটু ঘোরাঘুরি, সিনেমা দেখা, পার্কে বসা, রেষ্টুরেন্টে খাওয়া এইসব। বিয়ে করব তেমন ইচ্ছা খুব ছিল না। আরে ভালোবাসা মানেই কি বিয়ে? কিন্তু তোর বউদি সেকথা শুণে রীতিমতো হুমকি দিয়ে আমায় বলল, ''শোন, তুমি যদি আমায় বিয়ে না কর, তবে আমি আত্মহত্যা করব, আর তোমাকেই দোষী করে যাব। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেবার জন্য তখন তোমায় দশ বছর জেলে ঘানি টানতে হবে।'' আমরা বললাম সে কি গণুদা, তাহলে তো আপনি ঠিকই করেছেন! না হলে তো অ্যাদ্দিন আপনাকে জেলে থাকতে হতো।'' কাষ্ঠ হাসি হেসে গণেশদা বললেন, কিন্তু দ্যাখ্, দশ বছর বাদে, আজ তো আমি মুক্ত হতাম, স্বাধীন হতাম! কিন্তু এখন তো আমি জেল না খেটেও যাবজ্জীবন বন্দী।''

কোথায় যে পড়েছিলাম — 'Marriage with a good Woman is a harbour in the tempest; with a bad woman is the tempest in the harbour.'। এটি কার কথা মনে নেই, কিন্তু মনে পড়ছে মহান সক্রেটিসের উক্তি। তিনি নাকি বলেছিলেন, যে ভাবেই পারো, একটা বিয়ে কর। যদি ভালো বউ পাও, জীবনে সুখী হবে। আর যদি আমার স্ত্রী-এর মতো একটা দজ্জাল বউ কপালে জোটে, তাহলে দার্শনিক হবে।' তা সকলেরই বউ যে দজ্জাল, তা তো নয়! কিন্তু বিবাহিত সব পুরুষই যে কম-বেশী দার্শনিক, তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

একটা ভিনদেশী প্রবাদ আছে, 'মেয়েরা কাঁদে বিয়ের আগে, ছেলেরা বিয়ের পর পর থেকে'। কথাটাতে অনেকেই আপত্তি করতে পারে, কারণ কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। কিন্তু যে কথাটাতে

পুরুষমহলে খুব একটা আপত্তি হয়তো উঠবে না, তা হলো রবিঠাকুরের গানের এক ভিন্নতর ব্যাখ্যা। 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা' এই লাইনটি নাকি সদ্য বিবাহিত পুরুষের মনে মনে গাওয়া সঙ্গীত!

বিবাহিতা মহিলারা যতই শোরগোল তুলুন না কেন এই বলে যে, পুরুষশাষিত সমাজে তাঁদের অবস্থা খুবই করুণ এবং স্বামীর ইচ্ছাতেই তাঁরা চালিত হন, বিবাহিত জীবন নিয়ে প্রচলিত রসিকতাগুলি মোটেই সে সাক্ষ্য দেয় না। সেখানে কিন্তু আমরা অন্যরকম ভাবনার প্রতিফলন দেখি। যেমন ধরুন এই চুটকিটি — দুই বন্ধুর রাস্তায় হঠাৎ দেখা। একথা সে কথার পর বন্ধু বলল, তারপর, তোর বউ কেমন আছে? কেমন চলছে তোদের বিবাহিত জীবন! দ্বিতীয় বন্ধু বলল, আর বলিস না, অশান্তি লেগেই আছে। এইতো কালই একচোট ঝগড়া হয়ে গেলে বউএর সাথে।

প্রথম বন্ধু — কি রকম

দ্বিতীয় বন্ধু — আরে কাল সন্ধ্যাবেলা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বউকে বললাম, চল অনেকদিন কোন নাটক দেনি নি, আজ একটা নাটক দেখে আসি। বউ বলল না, নাটক নয়। অনেকদিন সিনেমা দেখিনি, আজ যখন তোমার সময় আছে, চল একটা সিনেমা দেখে আসি। ব্যস, শুরু হয়ে গেলো কথা কাটাকাটি! প্রথম বন্ধু গম্ভীরভাবে বলল, বুঝলাম, তা তোরা কাল কোন সিনেমাটা দেখলি?

বিয়ে সংক্রান্ত এই চুটকিগুলোতে যেমন উঠে এসেছে স্বাধীনতাহীন এক অসহায় পুরুষের হতাশা, পাশাপাশি আর এক ধরনের চুটকি বাজারে খুবই চালু। তা হলো, স্ত্রী মানেই তো খরচের আধিক্য! যেমন এই গল্পটি — ওষুধের দোকানের সামনে সকালবেলা অজয় আর জিতেনের দেখা। জিতেন বলল, 'সকালবেলায় ওষুধ কার জন্য রে!' অজয় বলল, আরে দেখ্না। কাল রাতে বউকে নিয়ে বাইকে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় ঝড় উঠল। একটা বালি উড়ে এসে পড়ল বউ এর চোখে। সে কিছুতেই যায় না। সকালবেলা ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ কিনে শুধু শুধু পাঁচশ টাকা বেরিয়ে গেল। শুনে অজয় বলল, এ আর এমন কি? কাল রাতে বাজার গিয়েছিলাম বউকে নিয়ে। শাড়ির দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা শাড়ি বউ এর চোখে পড়ল। ব্যস্! অমনি বেরিয়ে গেল কড়কড়ে পাঁচহাজার টাকা।

এই ধরণের গল্পগাছার শেষ নেই। কিন্তু 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন গোলাপ তুলিতে' প্রবাদ মাথায় রেখে অকুতোভয় পুরুষ এইসব চুটকিগল্প, রটনা, সতর্কবাণীকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গান গেয়ে যুগযুগান্ত ধরে টোপর মাথায় পরে স্ত্রীর বশ্যতাই মেনে নিয়েছে। নিতেই হবে, কারণ স্ত্রী-শক্তি। তাই ব্যতিক্রমী পুরুষ ছাড়া সাধারণ ভাবে বিবাহিত মানুষ স্ত্রীর কাছে শক্তির প্রদর্শন করার দুঃসাহস দেখায় না।

ব্যতিক্রম অন্যদিকেও আছে। বিবাহবদ্ধ কোটি কোটি মানুষের ভিড়ে সেইসব 'চিরকুমার সভা'র সদস্যর দল। এইসব চিরকুমারদের দিকে তাকিয়ে বিবাহিত পুরুষরা হিংসায় পুড়তে পুড়তে যতই দীর্ঘশ্বাস ফেলুন না কেন, বিয়ে না করার জন্য এ হেন বহু কনফার্মড ব্যাচেলরকে একটা বয়সে পৌঁছে ঘনিষ্ঠ জনের কাছে আক্ষেপ করতে দেখা গেছে।

এইসব চিরকুমারদের দলে বিশিষ্ট মানুষের সংখ্যা কিন্তু মোটেই ফেলনা নয়। এদেশে যেমন সদ্য প্রয়াত সর্বজন শ্রদ্ধেয় আব্দুল কালাম মহাশয়, সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, কর্মযোগী মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় বা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, উমাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অটলবিহারী বাজপেয়ী-দের মতো বিশিষ্ট জনেরা আছেন, বিদেশেও স্বনামধন্য ব্যাচেলরদের তালিকায় পাবেন আইজ্যাক নিউটন, বেঠোফেন, ফ্রান্দজ কাফ্‌কা, ভিনসেন্ট্ ভ্যানগগ্, হেলেন কেলার, এমিলি ব্রন্টের মতো মানুষদের। মনুষ্যসৃষ্ট চরিত্রের মধ্যেও বিয়ে না করা কিন্তু এলিজিবল্ ব্যাচেলারের দেখা আমরা পাই যাদের মধ্যে আছে স্বনামধন্য প্রদোষচন্দ্র মিত্র বা ফেলুদা, বিখ্যাত জেমস্ বন্ড বা সবার প্রিয় টিনটিন।

বিয়ে যারা করে তাদের সবার ক্ষেত্রেই বিয়ে করার কারণটা মোটামুটি একই। অর্থাৎ, বিয়ে করতে হবে বলেই বিয়ে করা। কারণ, এটাই তো রীতি, এটাই তো প্রথা। এটাই তো হবার কথা। এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বিয়ে যারা করে না, তাদের ক্ষেত্রে কারণটা একই নয় — একেকজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের বয়সে উপার্জনের অপ্রতুলতা বা জীবনটাকে ঠিকমতো গুছিয়ে তুলতে পারার অক্ষমতা এবং অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় তারা বিয়ে করার কথা ভাবতেও ভয় পায়। যেমন, কিনু গোয়ালার গলির সেই মানুষটি, যিনি সওদাগরী অফিসে কাজ করে নামমাত্র রোজগার করেন, টিউশনি করে অন্ন জোটান এবং আলো জ্বালাবার ভয়ে বাইরে সন্ধ্যা কাটান — তাঁরও কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি পালিয়ে বাঁচে ন এবং এই ভেবে স্বস্তি পান যে অন্তত মেয়েটা

রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু মেয়েটির থেকে বহিরঙ্গে পালিয়ে এলেও, অন্তরঙ্গে কিন্তু তার থেকে পালাতে পারেন নি। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মেয়েটির কথা তাঁর মনে পড়ত।

বিয়ে না হলে কি হয়। নিঃসঙ্গতা আসে? এক ধরনের Loneliness সৃষ্টিশীল যাঁরা, যাঁদের নাম আমি আগেই বলেছি। তাঁদের ক্ষেত্রে হয়তো এই নিঃসঙ্গতা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। কারণ তাঁদের বিরাট সৃষ্টির জগত হয়তো তাঁদের সেই নিঃসঙ্গতাকে দূরে রাখে। তাঁদের কর্মই তো তাঁদের সঙ্গী। কিন্তু যারা আমজনতা, যাদের এঁদের মতো কর্মময় জীবন নয় তারা যদি নিজেদের ক্ষুদ্র গন্ডী থেকে বেরিয়ে বৃহৎ সংসারের কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলতে পারে, তাবে একটা সময় এসে তাদের খুব অসহায় হয়ে পড়তে হতে পারে। সেইজন্যই অনেককে দেখা যায় শুধুমাত্র একজন সঙ্গীনির প্রয়োজনে বিয়ের নির্ধারিত বয়স পেরিয়ে এসেও বয়সকালে কারও পানিপ্রার্থী হতে। যদিও সেই অর্থে বিয়ের কোন নির্ধারিত বয়স হয় না। সেতার ওস্তাদ রবিশঙ্কর, চ্যার্লি চ্যাপলিন বা কিশোর কুমারের মতো মানুষ বেশী বয়সে এসে মনের মতো জীবনসঙ্গী খুঁজে নিয়েছিলেন।

'বিবাহ' সত্যিই মানব জীবনের এক অসাধারণ আবিস্কার। জীবনধারাকে শৃঙ্খলার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখার এক অসাধারণ ব্যবস্থা। সমাজের বুনিয়াদ, শান্তি, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এই প্রথার মাধ্যমেই অটুট থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। 'বিয়ে' জীবনের সবরকম স্বাদ - অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষা আমাদের আস্বাদন করায়। বিয়ে নিয়ে দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়গা ওহ্‌ভি পস্তায়গা, যো না খায়া ওহ্ ভি'', বিয়ের কোন বিকল্প নেই। তাই বিয়ে থাকবেই। শুধু পরিবর্তন হবে কতকগুলি বহিরঙ্গের, যেমন ম্যারাপের বদলে ভাড়াভাড়ি বা খাওয়ার মেনুতে বা ঘটকের বদলে শাদি ডট্ কমের প্রচলন।

স ত্যি বি য়ে র গ ল্প

প্রণবকুমার দাস

সত্যি একটা বিয়ের গল্প বলছি তোমায় শোনো,
যদি কারুর সাথে মিল খুঁজে পাও রাগ কোরোনা যেন।

এতদিনে বিলাসকুমার বিয়ে করতে রাজী
তাই নিয়ে কেউবা জেতে কেউ বা হারে বাজী।

বিলাসকুমার বললে ডেকে ''শুনো সর্বজন,
বিয়ে করবো পণ নেব না এই করেছি পণ।

খাতা কলমে করবো বিয়ে ভূতের ভোজন নয়,
সাক্ষী-সাবুদ, বাড়ীর লোক দু'চার জন যা হয়।''

মেয়ের জন্য পাড়ায় সেকি পড়ে গেল ধূম,
নাওয়া খাওয়া ছুটলো সবই ছুটে গেল ঘুম।

সবাই আনে মেয়ের খবর বায়োডাটা আর ছবি,
বিলাসকুমার রাত্রি জেগে খুঁটিয়ে দেখে সবই।

''উপযুক্ত নয়তো কেউই নয়কো মানান সই,
বিয়ে করবো তেমন পাত্রী খুঁজে পেলাম কই?''

অবশেষে একটা পাত্রী মনে ধরে ভারী,
দেখতে শুনতে, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুই মাঝারি।

বায়োডাটা দেখেই সানাই বাজলো অন্তরে,
যেন, কৃষ্ণের বাঁশীর অপেক্ষায় রাধা বসে ঘরে।

বাবা-মায়ের একটিই মেয়ে আছে বাড়ি-গাড়ি,
বিলাসকুমারের হলো বিয়ে সব জল্পনায় দাঁড়ি।

পণ নিলো না করলো বিয়ে মনেতে নেই খেদ,
দেখলো সবাই, বিলাসকুমার রাখলো তারই জেদ।

শেষটা শোনো, নইলে আমার গল্পটা বৃথাই,
বছর ঘুরতে না ঘুরতে, সে পাক্কা ঘরজামাই।

রকমারী বিবাহ কথা

ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

বহু মানুষেরর দেশ ভারতবর্ষে বাস নানা ধর্ম, নানা ভাষাভাষী, নানা কৃষ্টির ও বিচিত্র খাদ্যাভাসে অভ্যস্ত মানুষ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহের পদ্ধতি একরকম নয়। বৈচিত্রই এর মূল কথা। মনুর বিধান অনুসারে মেয়ের ক্ষেত্রে ৮ ও ছেলের ক্ষেত্রে ১৪ ধরে গৌরীদানের প্রথা একসময় সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল। এখন গোটা ভারতেই এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত কিন্তু বাল্যবিবাহের নীতি আইনের তোয়াক্কা না করে এখনও বলবৎ রয়েছে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে।

রাজস্থানে বিয়ের মূলকথা হল পাত্রপাত্রীর নির্বাচন। দু'পক্ষে পাকা কথা হবার পর মেয়েকে ছেলের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয় প্রথা অনুযায়ী। মেয়েকে নিয়ে আসে নাপিত বউ, যাকে রাজস্থানীরা বলে 'তাহিজী'। আর নিমন্ত্রণ করে আনার এই অনুষ্ঠানের নাম 'আনবুজ মুহরত'। আচার অনুষ্ঠানের পর পাত্রপক্ষের তরফের কোন বউ আর ঐ তাহিজী মেয়েকে আবার নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয়পর্বে হয় আর এক অনুষ্ঠান এর নাম 'তিলকসেরমন'। কন্যাপক্ষের আত্মীয়রা দল বেঁধে আসেন ছেলের বাড়ি সেখানে ছেলের বাড়ির আত্মীয়রাও উপস্থিত থাকেন। ছেলেকে কপালে তিলক পরানো হয় এবং ধুমধাম সহকারে গণেশের পুজো হয়। সকলের সামনে 'কুমকুম পত্রিকা' পড়া হয়। এই পত্রিকায় বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান ও দরকারী ঠিকানাপত্র লেখা থাকে।

বিয়ের সাতদিন আগে সাতজন এয়োতি (যাদের স্বামী ও সন্তান জীবিত আছে) ছেলের বাড়িতে তৈরি করে সুপারির গণেশ ও একটি ছোট ছেলেকে গণেশ সাজিয়ে ঐ সুপারির গণেশের সঙ্গে পুজো করা হয়। পরের অনুষ্ঠান 'তেলবান চড়ানো'। বর কনে দু'পক্ষের বাড়িতেই এই অনুষ্ঠান হয়। একটি থালায় মেহেন্দি পাতা, দুর্বা, বাটা হলুদ ইত্যাদি নিয়ে ছেলেকে স্নান করায় নাপিত আর মেয়েকে স্নান করায় নাপিত বউ। দুই অনুষ্ঠানেই খুব ঘটা করে খাওয়াদাওয়া হয়, দুই বাড়িতেই চলে প্রসাদ বিতরণ, যে প্রসাদ নিয়ে যায় দু'বাড়ির ব্রাহ্মণ। এরপর মূল বিয়ের অনুষ্ঠান খুব জাঁক জমক করে হয়।

কর্ণাটকে নিয়ম আবার আলাদা। এখানে মেয়ে বিয়ে করতে আসে ছেলেকে। এই রাজ্যে পাকা দেখার নাম 'নিম্‌চাইয়া'। বিয়ের তিনদিন আগে থেকে মেয়ে শিবপুজো করতে শুরু করে। বিয়ে করতে আসার সময় প্রচুর খাবার সঙ্গে নিয়ে বরের বাড়ি আসে। বিয়ে শেষ হবার পর কনে নিজের বাড়ি থেকে আনা বিছানায় একা শোয়। মঙ্গলসূত্রে গিঁট দেবারও অভিনবত্ব আছে। তিনটি গিঁটের দুটি দেয় বর অন্যটি বরের বোন বা দিদি। তামিলনাড়ুতে কিন্তু মঙ্গলসূত্রের তিনটি গিঁটই বাঁধে বর। মহারাষ্ট্রে আবার রীতি অন্যরকম ছেলের বাড়িতে এসে পরের দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে (সূর্য ওঠার আগে) বাসি মঙ্গলসূত্র খুলে নতুন মঙ্গলসূত্র পরানো হয়। তখনই মহিলাদের বদলে উপস্থিত পুরুষরা কুলো বাজিয়ে বিয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

মারাঠি সম্প্রদায়ে পাকা দেখার পর অনুষ্ঠিত হয় 'বচনসুপারি' বা কথা পাকা করার অনুষ্ঠান। কন্যাপক্ষের লোকেরা বরকে আশীর্বাদ করেন এবং বরের বাড়িতে সুপারি, নারকেল, মিষ্টি ইত্যাদি নানা দ্রব্য পাঠান। আবার 'সাখর পুজো' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরপক্ষ কনেকে আশীর্বাদ করে একই রকম ভাবে।

গুজরাটে বিবাহের অনুষ্ঠানের মূলকথা হল গণেশের পুজো এবং ঐ পুজোতে যে প্রদীপ জ্বালানো হয় তা বিয়ে শেষ হওয়া পর্যন্ত গণেশের ঘরেই জ্বলতে থাকে। গণেশ পুজো শুরু হওয়ার পর পাত্রপাত্রী পরে নেয় মিন্ডাল নামের একরকমের ফল। যাকে শুকিয়ে মাঝে ফুটো করে হাতে বাঁধা হয়। তবে এখানে বিয়ের খাবারে বিরিয়ানি, পোলাও, কোপ্তাকাবাবের বদলে থাকে ভাত, ডাল, চাপাটি, লাড্ডু বা নিরামিষ ভোজের আয়োজন।

গুজরাটে বিয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল গান, মেয়েরা দলবেঁধে পাকা দেখার পর থেকে নানা সময় নানারকম গান গেয়ে যায়। যেমন লগ্নগীত, এটি গাওয়া হয় যখন বর বিয়ে করতে আসে, কনের বাড়িতে বর চলে এলে বিয়ের শুরুর সময় গাওয়া হয় বিবাহগীত আর বরকনে বিদায় নেওয়ার সময় গাওয়া হয় বিদাগীত।

শিখদের বিবাহের অনুষ্ঠানের নামই 'আনন্দবার্থ', যা মূলত অনুষ্ঠিত হয় সকালে তবে দুপুর বা সন্ধ্যায় হতেও কোন বাধা নেই। মূল বিয়ে শুরু হবার আগে 'আরদাস' বলে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। গুরুদোয়ারের প্রধান পুরোহিত গ্রন্থসাহেবের সামনে বরকনের পরিচয় করিয়ে দেন তার পর উপস্থিত সকলে ঈশ্বরের

কাছে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সময় একজন বয়স্ক মানুষ 'হুকুমনামা' পাঠ করেন। এই পাঠ চলার সময় যিনি পাঠ করেন তিনি আর বরকনে দাঁড়িয়ে থাকেন বাকিরা মাটিতে বসে তা শোনেন।

উত্তরপ্রদেশে পাকা কথার পর পাত্রীপক্ষকে পাত্রপক্ষ একটুকরো তুলোট কাগজে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা সিঁন্দুর মাখানো 'শা-পাট্টা' দেয় যার অর্থ এখানেই বিয়ে হবে। বিয়ের দিন বরযাত্রীরা কনের বাড়িতে চলেএলে একজন এয়োতি সকলকে মেটে সিঁন্দুরের টিপ পরিয়ে দেয়। এর জন্য তাকে দক্ষিণা দিতে হয়। এদের বিয়েতে শাঁখ বাজানো ও উলু দেওয়া হয় না। বিয়ে বেদিতে 'ঘুংঘট' নামে ছোট একটি অনুষ্ঠান হয়। যেখানে ভাসুর একটি ভাঁজকরা শাড়ি পাত্রপক্ষের তরফ থেকে কনের মাথায় ঢাকা দিয়ে আশীর্বাদ করে।

আসামে বিচিত্র বিয়ে পদ্ধতিতে বিয়ের দু'দিন আগেই মেয়ে সিঁদুর পরে এবং সেই সিঁদুর কৌটা এবং অন্যান্য সামগ্রী ছেলের মা, মাসি বা মাতৃ স্থানীয়া কোন গুরুজন দু'দিন আগেই দিয়ে আসে। আসামে এই অনুষ্ঠানের নাম 'ঘাডুমণি'।

উড়িষ্যায় সম্ভবত বাঙলার সঙ্গে দীর্ঘকাল যোগাযোগ থাকায় বিয়ের সময় ছড়াকাটা বা নানা মজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সাতপাকে ঘোরানোর সময় বর যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন শালি বা শালারা দল বেঁধে ছড়াকেটে বরকে মিষ্টির ঢেলা ছুঁড়ে মারে, উড়িয়া ভাষায় এর নাম 'ছড়ামারা'।

বাঙলাদেশে বিয়েতে দই মঙ্গলসূচক হলেও ভারতের সব জায়গায় তা নয় যেমন উত্তরপ্রদেশে বিয়েতে দুধের তৈরী কোন খাবার দেওয়া হয় না কিন্তু উড়িষ্যায় এর চল আছে।

আবার বাঙলায় গ্রাম্য বিয়েতে এককালে খুব প্রচলিত ছিল 'হাড়ি মুড়ালি' খেলা। মজার এই খেলাতে বাড়ির বড় মেয়েরা চারটি ছোট মাটির হাড়িতে চাল ভরে আনে, বর ও কনে বসে মাঝখানে, চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ায় সকলে, তারপর সেই চাল ছড়িয়ে দেওয়া হয় মাটিতে। বর কনের কাজ হল সেই ছড়ানো চাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলে রাখা আর মনে মনে একে অপরের নাম উচ্চারণ করা কিন্তু অন্যকিছু শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। সে সময় শব্দ হলেই বিয়ের পরে ঝগড়া হবে এমনটা প্রথা, এ খেলায় এটাই মজা।

বিয়ের সামাজিক বন্ধনের মধ্যে এই বিচিত্র ধরণের রীতিনীতিগুলি বৈচিত্রময় ভারতের অখন্ডতা রক্ষা করে চলেছে। যুগ পাল্টেছে মত বদলছে হয়ত কিন্তু এই আধুনিক যুগেও বিয়ে এখনও একটি আচারসর্বস্ব অনুষ্ঠান।

নাগাদের বিবাহ ঃ নাগাদের মধ্যে প্রায় ১৩ রকম জাতি আছে। সেমা, লোধা, চাং, সাঙতাম, আংগামী প্রভৃতি। বিয়ে ঠিক করার জন্য একজন বয়স্কা মহিলাকে দুত হিসাবে পাঠানো হয়। আংগামী নাগাদের মধ্যে বিয়ে হয় মা - বাবার মতে ও তাদের পছন্দে কিন্তু মা-বাবা দু'জনেই ছেলে বা মেয়ের মতামত জেনে নেন। বিয়ের আগে মেয়ে ছেলের বাড়ীতে আসে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসে রান্না করা খাবার কারণ বরের বাড়ীর কোন খাবার মেয়ের বাড়ীর লোকেরা খাবে না। যদি কোন খাবার বেঁচে যায় তাহলে সেটা মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয়। খুব ভোরে উঠে বরের বাড়ী থেকে জল আনার জন্য যে কলসি দেওয়া হয় তা নিয়ে কনে কুয়োতে জল আনতে যায়। জল এনে নতুন উনুন বানায়, সেই নতুন উনুনেই নতুন বাসনপত্র দিয়ে দ্বিতীয় দিনে রান্না হয়। রান্নার জিনিষপত্র চাল, ডাল, শাকসব্জী সবই দেয় বরের বাড়ীর লোকেরা, খাওয়া দাওয়ার পর কনের বাড়ীর লোকেরা বরের বাড়ী থেকে নানা উপহার নিয়ে ফেরত যায়। বিয়ে হয়ে যাবার পর বর কনে দু'জনেই কনের বাড়িতে যায়, কনের বাড়ীর লোকেদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং আসার সময় প্রচুর উপহার দিয়ে ফিরে আসে। সেমা নাগাদের বেলায় জিনিষপত্র দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা অনেক বেশী পরিমাণ থাকে। ইমচুংগার নাগাদের বিয়েতে মেয়ের বাবাকে ছেলের বাবা মুরগী, ছাগল, পাঁঠা ইত্যাদি কোন পশু দান করতেই হয়।

সাঁওতালদের বিবাহ ঃ সাঁওতাল সমাজে বিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান এরাও ঘটকের সাহায্য নেয় পাত্রী পছন্দের জন্য। তবে পাত্রপক্ষের লোকেরা কিছু চিহ্ন দেখে নেন। মেয়ের গ্রামের যিনি মোড়ল বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তেল-হলুদ মাখা এবং সিন্দুর দান সাওতাল বিয়ের একটি বড় অঙ্গ। সিঁদুরদানের সময় পাত্রকে কাঁধে তোলা হয় আর কনেকে একটি ডালায় বসিয়ে পাত্রের মুখোমুখি রাখা হয় এরপর কন্যাপক্ষের লোকজন একঘটি জল ও আমপাতা বরের হাতে তুলে দেয় বর সেই জল কনের মাথায় ছিটিয়ে দেয়, এরপর বরের হাতে তুলে দেওয়া হয় পাঁচটি শালপাতা যার একটি পাতায় মাখানো হয় সিঁদুর। বর ডানহাতের কড়ে আঙুল দিয়ে পাঁচবার কনের কপালে পরিয়ে দেয়। তবে সাঁওতাল সমাজে নানারকম বিয়ের চল আছে।

খ্রীষ্টান বিবাহের রীতিনীতি

স্নিগ্ধা বিশ্বাস

খ্রীষ্টান বিয়েতে বর কনের সম্মতিই মুখ্য। বিয়ের দিন স্থির হয় সাধারণত পরিচিত জনের মধ্যে খোঁজখবর করে বা ঘটকের সাহায্যে পাত্র নির্বাচন করা হয়। বিয়ের ৩ সপ্তাহ আগে দু'পক্ষই 'বাণপ্রকাশ' নামের এক বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন নিজ নিজ গীর্জায়। এটি আসলে এক বিশেষ ঘোষণা যার মাধ্যমে গীর্জায় প্রার্থনার দিন উপস্থিত সবাই জানতে পারেন কার সঙ্গে কার বিয়ে হচ্ছে এবং এব্যাপারে কোন আপত্তি থাকলে জানাতে পারেন। এব্যপারে গীর্জার সম্মতি আবশ্যক। নির্দিষ্টি দিনে প্রথমে যাজক, সাক্ষী, বর কনে দু'পক্ষের বাবা-মা আত্মীয় স্বজন সকলে একসঙ্গে গীর্জায় প্রবেশ করেন, এই সময় একটি মঙ্গলগীত গাওয়া হয় তারপর পবিত্র বাইবেলের কিছু বিশেষ অংশ পাঠ করার পর গীর্জার ধর্মযাজক এই বিয়ের মাহাত্ম তাৎপর্য গুরুত্ব সম্পর্কে বর কনেকে অবহিত করেন। এরপর ধর্মযাজক পাত্রপাত্রীকে কিছু সাধারণ প্রশ্ন করেন যেমন —

- এই বিয়েতে কি তোমরা সম্মত আছ?
- বাকি জীবন তোমরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পথ চলবে তো?
- তোমাদের যে সন্তান হবে সে হবে ঈশ্বরের সন্তান তাকে তোমরা ঠিক মতো লালনপালন করবে তো?

মামুলি এই রকম প্রশ্নগুলি শেষ হলে ধর্মযাজকের নির্দেশে বর কনে পরস্পরের হাত ধরে একে অপরকে বলে আমি তোমাকে স্ত্রী / স্বামী হিসাবে গ্রহণ করলাম। সুসময় - দুঃসময় আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। সারাজীবন আমরা একত্রে থাকব এবং পরস্পরকে মর্যাদা দেব। এরপর গীর্জার যাজক বলেন গীর্জার সাক্ষ্যে তোমরা সম্মতি দিলে তোমাদের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। ঈশ্বর যাদের যুক্ত করেন তারা যেন বিচ্ছিন্ন না হন। এরপর পাদ্রীমশাই বর কনের আংটি বদল করেন। এই আংটি হল এক বিশেষ ধরণের ওয়েডিং রিং। আংটি বদলের পর হয় সমবেত প্রার্থনা। বিয়ের অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি। বিয়ের ভোজ? সে তো দুই বাড়িতেই হয়। বিয়ে হয়ে যাবার পর কন্যা পক্ষের বাড়ীতে পাত্র পক্ষের লোকেরা ও আত্মীয়স্বজন সকলে চলে আসেন, ওয়েডিং কেক কাটা হয় ও খাওয়া দাওয়া হয়। আর বৌভাতের দিন পাত্র পক্ষের বাড়ীতে হয় আলাদা খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠান। বাঙালী খ্রীষ্টান পরিবারে বিয়ের দিন গায়ে হলুদ ও তত্ত্ব পাঠানোর রীতি আছে। এমনকি সিঁদুর দানও হয়। বর বিয়ের শেষে কনের বাড়ীতে যে অনুষ্ঠান হয় সেখানে আংটি দিয়ে সিঁদুর পরায়।

এছাড়া আছে 'এনগেজমেন্ট' এটি বিয়ের আগের এক অনুষ্ঠান যেখানে পাকা কথা সেরে রাখা হয়।

মুসলমান বিবাহ বা নিকাহ

রেওয়াজ আহমেদ

শরিয়তী নিয়ম মতে ১৫ বছর না হওয়া পর্যন্ত কোন ছেলে এবং রজঃস্বলা না হওয়া পর্যন্ত কোন মেয়ে 'বালিগ' বা 'স্বাবালক' নয়। তবে নাবালক ছেলেরও বিয়ে হয়। সেই বিবাহ তার হয়ে করাতে পারেন তার বাপ ঠাকুরদা। একমাত্র নাবালক নিকাহতেই বাপ ঠাকুরদার ভূমিকা আছে কিন্তু সাবালক হয়ে গেলে বাপ-মা-ভাই-বোন কারোরই প্রয়োজন পড়ে না বিয়ের ক্ষেত্রে। ইসলামী বিয়েতে হিন্দু বিয়ের মত পাঁজিপুথি দেখে দিনক্ষণের কোন ব্যাপার নেই শুধু দুটি ব্যাপারে কড়া নিয়ম আছে। নিকাহে কোন দাহেজ বা পণ নেওয়া যাবে না এবং কোন অনিচ্ছুককে জোর করে বিয়ে দেওয়া যাবে না। নিকাহ অনুষ্ঠান আসলে এই সম্মতিদানেরই অনুষ্ঠান। বরের সম্মতির নাম 'কবুল' আর কনের সম্মতির নাম 'ইজাব'।

দু'জন মুসলমানকে সাক্ষী রেখে কাজীর সামনে এটুকু ঘোষণা করলেই বিয়ে শেষ। কিন্তু বিয়েতে মাঙ্গলিক দিক হিসেবে কোরান ও হাদিস পাঠ করা হয়। কোরানে আল্লা বলেছেন "তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করবে, এক প্রাণ থেকে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হয়েছে তাই যাকে তুমি স্ত্রী হিসাবে স্বীকার করছ তাকে তার 'হক' দেবে। চাইলে ঈশ্বর তোমায় সাজা দেবেন। তাকে কষ্ট দেবেনা, সত্য কথা বলবে, সৎ পথে চলবে এবং ঈশ্বর ও ধর্মকে সর্বদা সম্মান করবে।" এটি পাঠ করার পর হবু স্বামী বা 'খসম'কে মনে করিয়ে দেওয়া হয় বিবাহিত স্ত্রী তার কাছে তিনটি জিনিষের হকদার। এই তিনটি জিনিষ হল - খাবার, পোষাক, বাসস্থান। কোরানের পর পাঠ করা হয় হাদিসের কিছু অংশ বা মহম্মদের বাণী যেখানে তিনি বলেছেন "আমি নিজে নিকাহ করেছি তোমরাও কর বিবাহ এক পবিত্র কাজ।" এখানেই বিয়ে শেষ এরপর হয় 'ওয়ালিম' অর্থাৎ ভুরিভোজের অনুষ্ঠান।

শুভ বিবাহের ছড়া

তাপস বাগ

যে কোন বিয়েই এক সুন্দর ও আনন্দময় অনুষ্ঠান। বাঙালির বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের শেষ নেই। জল সওয়া থেকে দ্বিরাগমন নানান অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি। সেকালের বিয়েবাড়িতে আরও একটি উপকরণের চল ছিল। সেটা হল বিয়ের পদ্য বা ছড়া। গল্প, আড্ডা, ভুরিভোজের পাশাপাশি এক বা একাধিক কাগজে ছাপা ছড়া হাতে পাওয়া যেত। এগুলি লিখে দিতেন মূলত বর-কনের আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবরা। প্রীতিভোজের মেনুকার্ডে খাদ্যের উপকরণগুলি পরপর সাজিয়ে ছড়া বা রম্য খবর জাতীয় লেখা এখনও দেখা যায়। সব ক্ষেত্রেই ছড়া বা পদ্যগুলি যে উচ্চমানের হত তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অন্তমিল বজায় রেখে বর-কনেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছড়া লেখার কাজ সারা হয়। তবে এধরণের কর্মকান্ডে একটা সাংস্কৃতিক রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিয়ে নিয়ে পদ্য কে লেখেন নি? রবিঠাকুর থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো নামী কবি সাহিত্যিকরা যেমন লিখেছেন তেমনি বহু অনামী লেখক ও সাধারণ মানুষ নিকটজনের বিয়ে উপলক্ষে ছড়া লিখেছেন।

প্রথমেই আসা যাক রবীন্দ্রনাথের লেখা বিয়ের ছড়ায়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে জয়শ্রীর বিয়েতে কবি আশীর্বাণী স্বরূপ লিখলেন —

‘তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌটা
সাতচড়ে কভু যেন কথা মুখে না ফোটে
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে
শাশুড়ি না বলে যেন কি বেহায়া বৌটা ....’

আবার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা ইন্দিরার শুভ পরিণয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন —

‘সেদিন উষার নববীণা ঝংকারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা
ধেয়ে চলেছিল কৈশর পরপারে
পাখি দুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা
সুরভবনের মিলন মন্ত্র লেগে
কবে দু’জনের পাখায় ঠেকিল পাখা। ....’

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত ‘শুভ বিবাহ তত্ত্ব’ পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল বিয়ের এই ছড়াটি —

(১)

কেন আজি হাসি - রাশি অবনী - ভিতরে?
কেন আজি বাজে বাঁশী সুললিত স্বরে?
কেন গাছে পিক - কুল,
কেন হাসে বন - ফুল,
কেন নাচে তারা-দল স্বরগ - উপরে?
চারি - দিকে হাসি আজি এ ধরা মাঝারে।

(২)

বুঝেছি বুঝেছি এবে জেনেছি অন্তরে,
পরিণয় সূত্রে আজি কর বাঁধিবারে।
হইতেছে অগ্রসর
ধরিয়া পতির কর
যেতেছে আপন ঘর ‘‘জহরের’’ সনে।
তাই আজি হাসি - রাশি সবার আননে।

সার্থক শিশুসাহিত্যের স্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও লিখেছেন বিয়ের ছড়া। পাল্কীর গান, দূরের পাল্লা-র প্রসিদ্ধ রূপকার সত্যেন্দ্রনাথের লেখা বিয়ের ছড়ার কিছুটা —

‘পরমেশ! আজি বরিষ তোমার
আশিষ যুগল শিরে;
কর পবিত্র পুষ্পেরি মত,
এ নব দম্পতিরে।
আজি হতে তারা বাহিবে তরণী
অকূল সিন্ধুনীরে;
রহে যেন নভঃ কিরণে পূরিত,
বায়ু বহে যেন ধীরে।’

কবি মোহিতলাল মজুমদার ‘বিবাহ মঙ্গল’ নামে একটি সনেট লিখেছিলেন লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ে উপলক্ষে।

‘জীবন - দুয়ারে তব দাঁড়ায়েছে নারী

আজ বধু, কাল জায়া, পরে পথশেষে
হাতে হাত রাখি পুনঃ অমৃত উদ্দেশে
বাহিরিবে একসাথে; সীমন্তে তাহারি
সিন্দুর দানিবে যবে যত্নে অপসারি
মুখাবগুণ্ঠন - কুমারীর কালো কেশে
অকস্মাৎ সেই দীপ্তি হেরি, মোহাবেশে
চেয়ে রবে আঁখি তব বিস্ময়ে বিস্ফরি
সহজ সুলভ সে যে - সে ক্ষণ বিস্ময়!
তব ভাগ্যে, জীবনের নিত্য - নিশিমুখে
এমনি সীমন্ত রচি, যাদুমন্ত্রময়,
যেন তব চক্ষে ধরে যৌবন অক্ষয়
আজিকার নববধু - আত্মহারা সুখে
অমর দম্পতি প্রেম জরা করে জয়।'

১৯৪০-এর দশকে হাওড়া নিবাসী শ্রীমতি ইলা চক্রবর্তী তাঁর মামার বিয়ে উপলক্ষে এই ছড়াটি শুনেছিলেন —

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল
মামার বিয়ের ফুল ফুটিয়া উঠিল।
জিনিস কিনিতে সবে যায় ছুটে হাটে
চঞ্চল হইল মন নিজ নিজ পাঠে।
গলায় গোড়ের মালা সৌরভ ছুটিল
লুচির গন্ধে লোক আসিয়া জুটিল।
কড়ায় পান্তুয়া ভাসে লোহিত বরণ
আস্বাদ পাইয়া লোক পুলকিত মন।
ওঠ মামা মুখ ধোও পর নব বেশ
মামীমাকে আনিতে মন করহ নিবেশ।

সেকালের বিয়েতে রঙ্গ তামাশা করেও কবিতা লেখা হয়েছে। বিপত্নীক জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলমণির সঙ্গে। শিক্ষাবিদ জ্ঞানেন্দ্রমোহন হিন্দু কলেজে মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে কমলমণিকে বিয়ে করেছিলেন। ধর্মান্তকরণের দোষে তিনি সমাজের একাংশের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাঁকে বিদ্রুপ করে লেখা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন —

'বিবি বলে সাহেব কি মোর রয়েছে চুপ করে।
জ্ঞানের অজ্ঞান করে অনিয়াছে হরে।।
এই মার্চে লাল চার্চে মিসির হবে ম্যারেজ।
দেখবে ঘটা, বলব কথা, লাগবে এসে ক্যারেজ।।'

২০১১ সালে শৌভিক ও স্বাতীলেখা-র বিয়েতে পরিচিত কাকা কৃষ্ণ পাল লিখেছিলেন একটি ছড়া। শ্রীপাল-এর সেই ছড়ার কয়েকটি লাইন —

'আমার ভাই-পো শৌভিকের অদ্য বিয়ের রাতে,
লিখছি ছোট্ট কবিতাখানি, ঘুরবে হাতে হাতে।
কেমন ভাই-পো শৌভিক মোর তোমরা জান নাকি?
রূপেগুণে দু'দিক থেকেই — বলতে হবে তা কি?
পড়াশোনায়, আঁকাজোকায়, আচার - আচরণে,
দেখলে, শুনলে, মিশলে ভালবাসবে মনেপ্রাণে।......'

পরিতাপের বিষয় চিঠি লেখার চল যেভাবে প্রায় উঠেই গেছে, তেমনি ইদানিং বিয়ে নিয়ে ছড়া কবিতাও তেমন একটা দেখা যায় না। যদিও বিপুল আড়ম্বর ও উন্মাদনার পাশাপাশি প্রিয়জনের বিয়েতে ছড়া লেখার প্রথাটিকেও বাঁচিয়ে রাখা একান্ত জরুরি।

তথ্যঋণ ঃ
শৌভিক ও স্বাতীলেখা-র শুভপরিণয়ের নিমন্ত্রণ পুস্তিকা - ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ ।। গৌতম বসু মল্লিক ও ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায় - এর বিবাহ সংক্রান্ত লেখালেখি।

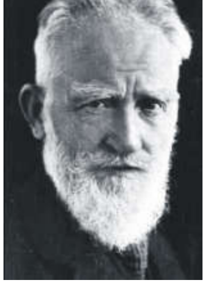

মেয়েদের লক্ষ্য রাখতে হবে তারা যত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে পারে, আর পুরুষের লক্ষ্য রাখতে হবে যত বেশী দিন তারা অবিবাহিত জীবন যাপন করতে পারে।

জর্জ বার্ণাড শ

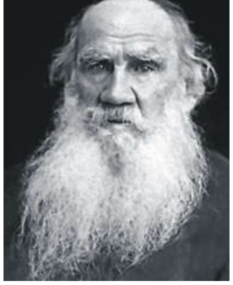

একমাত্র প্রেম-ই বিবাহকে পবিত্র করতে পারে। আর, একমাত্র অকৃত্রিম বিবাহ সেটা, যেটা প্রকৃত প্রেমের দ্বারা গঠিত।

লিও টলস্টয়

বিয়ে নিয়ে — প্রচলিত প্রবাদ

লমা রমা কুণ্ডস

প্রবাদ মানেই - স্ব স্ব ক্ষেত্রের পূর্বের মনোভাব ভাবনা চিন্তাকে জানা। তারই পরিচয় দান করে । সমস্ত প্রবাদই প্রাচীন যা মুখে মুখেই সমাজে ফেরে। বয়স্করা শোনান। নতুন প্রজন্ম যার সন্ধানই পায় না। পুরানো মানুষদের স্মৃতিতে যা ধরা থাকে, তারই প্রকাশ পায়। যা ক্রমে সমাজ হতে লোপ পাচ্ছে গুরুত্ব তাৎপর্য পাচ্ছে না। বর্তমান সংস্কৃতি চর্চার ধারা আবার তাকে ভীষণ ভাবেই কোণ ঠাসা একঘরে করে তুলেছে।

অথচ প্রচলিত প্রবাদই মূলত কোন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর পরিচয় দেয়। জানার বোঝার সোপন গড়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট প্রবাদবাহকদের কৃষ্টি সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রচলিত ধারার ভাবনা চিন্তা-র ক্ষেত্রে একটা প্রচ্ছন্ন জ্ঞান ধ্যান বোঝার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে ভোলে না।

এক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমবাংলার নানান জেলা থেকে বিয়ে সম্পর্কীয় প্রচলিত প্রবাদগুলি যা সংগৃহীত হয়েছে, তা জনসমক্ষে পরিচিতির লক্ষ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। যা যে কোন সমীক্ষক, গবেষক, অনুসন্ধানকারীর কাছে বেশ কৌতুহল জাগায়। প্রেরণা ধারণাও যোগাবে নিশ্চয়। কিছু প্রবাদ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ—

১. ঘর বাঁধতে চাই, বাঁশ - দড়ি,
বিয়েতে চাই, ঘটক ও কড়ি।

২. মেয়ে কুড়িতেই হয় বুড়ি,
তাই বিয়ে দাও, তার তাড়াতাড়ি।

৩. প্রজাপতি গায়ে বসলো —
বিয়ের ঠিক ফুল ফুটলো।

৪. বিয়ের জন্য মন
আঁকু - পাঁকু করে,
কবে হবে বিয়ে,
স্বপ্ন যাবে ঠিক পুরে।

৫. বিয়ের বাজারে মেয়েরাই দায়!
নগদ টাকা, সোনা দিয়ে করো বিদায়।

৬. বিয়ের পাত্র - পাত্রী সঠিক না হলে,
মেয়েকেই গলায় দড়ি দিতে হয় তাহলে।

৭. সোনা চিনবে ভাই জলে ভাসিয়ে —
মেয়ে চিনবে কিন্তু মন কাঁদিয়ে।

৮. তাড়াতাড়ি করো, জমি কিনতে,
কিন্তু কনে চিনো-আনো, বহু পরিচিতে।

৯. শশুড়বাড়ী মথুরাপুরী,
তিনদিন পরে ঝাঁটার বাড়ি!!

১০. বর দেখো গো, বর দেখো গো,
রান্না ঘরের ঝুল, বিলকুল!!
কনে দেখো গো, কনে দেখো গো —
হয় যেন ঠিক - কনক চাঁপা ফুল।

১১. মায়ের চেয়ে ঝি খরো,
তার মেয়েকেই বিয়ে করো।

১২. অভাগী কপাল তো তার,
বাপ বয়সী ভাতার যার।

১৩. কোথায় কনে,
তার দেখা নেই,
কড়ি গণার বেলা,
আছে এগিয়েই!!

১৪. ঘরের বধূ হয় লক্ষ্মী সোনা,
অঘটন ঘটলে, হয় ডাইনি - কানা!

১৫. লক্ষ্মী মেয়ে - অলক্ষ্মী হয়,
অপয়া বলে ডাকা হয়।

১৬. আহ্লাদি গো ঝি,
তোকে আঁচল চাপা দিই,
পরের ধরে যাবি চলে,
তখন করবো আমি কি?

১৭. যে মেয়ের সাত চড়ে
রা বের হয় না,
সে মেয়েকেই কনে করে
ঘরে আনো না।

১৮. বিবি যখন বড়ো হবে,
মিঞা তখন কবর পাবে।

১৯. বিয়ে বিয়ে বিয়ে,
মেয়ে সব নিলো খেয়ে।

২০. কপাল যার মন্দ হয়,
তার ঘরে মেয়ে রয়।
বিয়ের সময় পণ দিতে,
পথে বসে ভিক্ষা করতে হয়।

২১. কচি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা,
অপবাদের মরে সব রাস্তা।

২২. ওঠ ছুঁড়ি তো বে, ঘোমটা মাথায় দে।

২৩. খেতে পারো যদি
স্বামীর কিল - চড়,
বিয়ের যোগ্য কন্যা বলে,
বাড়বে তোমার দর।

২৪. অভাগীর স্বর্গ প্রাপ্তি,
স্বামীর হাতে মরলে নেই ক্ষতি।

২৫. ঘর - বাড়ী, জমা - জমি সব বন্ধক,
মেয়ের বিয়ে হয়, স্বামী মারে বেধড়ক।

২৬. কপালে সিঁন্দুর, পায়ে আলতা,
স্বামী সোহাগিনীর বাড়ে ক্ষমতা।

২৭. সুন্দরী কনে, ক'দিনে
যাবে বুড়িয়ে,
চলবে পাকা চুলে,
লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে।

২৮. দিবি তো দে মেয়ের বিয়ে,
সব কিছু হারিয়ে।

ভোজ কয় যাহারে !

জহর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে উৎসব আর ভোজ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া কোনো উৎসবের কথা যেন ভাবাই যায় না। বিবাহের অনুষ্ঠানও তো উৎসবেই পরিণত হয়েছে। তাই বিবাহের সঙ্গেও ভোজ জড়িয়ে আছে। বলা ভালো, বিবাহ অনুষ্ঠানের এটাই সবার আকর্ষণের আর চর্চার বিষয়। বিয়ের ভোজ বলতে আবার বিয়ের দিন পাত্রপক্ষকে আপ্যায়িত করতে কন্যাকর্তা যে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেন সেটার কথাই বলছি। তাবলে পাত্রপক্ষের ভোজও কিছু কম নয়।

বিবাহের সঙ্গে এই ভোজের জড়িয়ে পড়া ঠিক কবেকার ঘটনা তা খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, এটা খুব বেশিদিনের ব্যবস্থা নয়। কারণ বাৎসায়নের কামসূত্র, ঋষি কণ্বের কণ্বশাস্ত্র বা মহাকাব্য মহাভারতে যেসব বিবাহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে ভোজের উল্লেখ নেই। রাজা রাজড়াদের বা রাজকুমার, রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রজাদের উপহার দেওয়া হত, তাতে খাদ্য সামগ্রীও থাকত, কিন্তু পংতি ভোজনের ব্যবস্থা ছিল না। তখন বিবাহ ভোজ থাকলেও তা যে এখনকার মত এলাহি আয়োজনের ছিলনা বলাই বাহুল্য।

বিয়ের ভোজের শুরু আইবুড়ো ভাত দিয়ে

বিবাহ হল দুই নারী-পুরুষের একসাথে থাকার, অবাধ মেলামেশার ছাড়পত্র। নারী ও পুরুষটিকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন । এই ঘটনাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিতে অবশ্যই প্রতিবেশীজনকে উপস্থিত হয়ে সাক্ষী থাকার আমন্ত্রণ জানানো হত। বাড়িতে লোকজন এলে আমরা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকি। আর এ তো শুভ অনুষ্ঠান, এদিন তো আপ্যায়ন করতেই হবে। প্রথমে মিষ্টান্নের মাধ্যমেই আপ্যায়ন হত, পরে সেটাই বাড়তে বাড়তে আজকের রূপ নিয়েছে।

বিবাহের ভোজে কটা পদ বা কী কী পদ খাওয়ানো হবে তা রীতিমত সমস্যার ব্যাপার। এখন তো ব্যাপারটা আরো জটিল। জটিল মানে হাজারো পদের মধ্যে থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি একটি করে পদ বেছে নেওয়াটা মোটেই সরল নয়। তবে পুরনো কলকাতায় বিবাহের ভোজে কে কটা পদ করল সেটা ছিল বেশ চর্চার বিষয়। কেউ কেউ পদের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে ফেলতো। তবে সব পদ কিন্তু ভোজে খাওয়ানো হত না। বলা ভালো এক্ষেত্রে হাতির দাঁতের উপমা মানা হত, মানে দেখাবার পদ একরকম আর খাওয়ানোর পদ একরকম। ব্যাপারটা ছিল এই রকম, কন্যাকর্তা কন্যার বিবাহে কী কী আয়োজন করেছেন তা এক একটি মণ্ডপের বা স্টলের মত করে সাজিয়ে রাখতেন। এক একটি স্টলে এক এক জিনিস, দানের বাসন, গয়না, কাপড় থেকে ভোজের রান্না। এইসব জিনিস বিবাহের আগে বরকর্তাকে দেখানো হত। তিনি সন্তুষ্ট হলে বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু করার অনুমতি দিতেন। ভোজের রান্নার যেসব পদ দেখানো হত, সেগুলো নির্দিষ্ট মাপের পাত্রে করে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হত। খাওয়ানোর জন্য পদ অবশ্য নুন দিয়ে রান্না হত না। নিমন্ত্রিতরা কন্যাকর্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রাজি থাকলেও তার বাড়িতে নুন খেতে রাজি ছিলেন না। তাবলে কি আলুনি খাবার মুখে তোলা যায়। তাই ভোজের শুরুতেই পাতের একপাশে খানিকটা নুন পরিবেশন করা হত। এবার বুঝলেন তো 'সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে', আজও ভোজের পাতে প্রথমেই যেটা আসে সেটা নুন।

গত শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকে ভোজের ব্যাপারটা কেমন যেন পাল্টে গেল। কলাপাতা, মাটির ভাঁড়, খাবার-দাবার থেকে পরিবেশক — সব যেন ভোজবাজির মত বদলে গেল। এই বদলের প্রধান কাণ্ডারী 'ক্যাটারিং' ব্যবস্থা। যতদূর মনে পড়ছে কলকাতায় ক্যাটারিং ব্যবসার সূত্রপাত করে বিজলী গ্রিল। বিজলী সিনেমা হলের পাশে একটা ছোট খাবারের দোকান চালাতেন দেবু বারিক। দোকানটা

ছিল তার কাকার, নাম ছিল 'দীপ্তি কেবিন'। ১৯৪৭ সালে দেবু বারিক দোকানের দায়িত্ব পেয়ে নাম বদলে দেন 'বিজলী গ্রিল'। খাবারের দোকানের সঙ্গেই অনুষ্ঠান বাড়িতে খাবার পরিবেশনের কাজ শুরু করেন। অল্পদিনেই খুব নামডাক হল তাদের। এখন তো একদিনে ২০ - ২৫ টা অনুষ্ঠান বাড়ীর কাজ সামলে দেবার ক্ষমতা রাখেন তারা। তাদের দেখেই পরে ছোট বড় মাঝারি ক্যাটারার্সদের উৎপত্তি। এখন অবশ্য ক্যাটারিংকে ছাপিয়ে গেছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। বিয়েটাও একটা ইণ্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে।

বছর তিরিশ আগেও ভোজ বাড়ীর ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আর একটু পিছোলে তো সাবেকি ভোজ বাড়ীতে পৌঁছে যাব। অনেকেই হয়তো ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে লেগেছেন। কাপড় দিয়ে ঢাকা বাঁশের ম্যারাপে সার দেওয়া কাঠের লম্বা টেবিল। তার ওপর চৌকো কলা পাতা বা কাঠি দিয়ে জোড়া শালপাতার থালা। মাটির গ্লাস, মাটির খুরি। বসার জন্য কাঠের ভাঁজ করা চেয়ার। ভোজের পরিবেশনের জন্য রয়েছেন পাড়ার দাদা কাকারা। ফলে খাওয়ার সময় আবদার জোরাজুরি চলত, মনে হত বাড়িতে বসেই খাচ্ছি। ভোজ শুরু হত আজকের মতই নুন লেবু দিয়ে। স্যালাডের চল ছিল না। অবশ্য ডাক্তারবাবুরা বলেন, ভোজ বাড়ির স্যালাড এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তবে কাঁচা লঙ্কাও অনেকে দিত। মেনু কার্ড দেওয়ার প্রথা ছিল না। তাই এরপর কী আসবে সেটার কৌতুহল শেষ পদ পর্যন্ত বজায় থাকত। প্রথমে লেজওয়ালা মানে বোঁটা সমেত বেগুন ভাজা, গরম ফুলকো লুচি। পাতের নুনটা এই বেগুনভাজা খেতে কাজ দিত। তারপর ছোলার ডাল, আলুর দম। কুমড়োর ছক্কা, আলু ফুলকপির তরকারি, গ্রীষ্মে এঁচোড়, আলু পটলের ডালনা এমন রকমারি বাঙালি রান্না বিয়ে বাড়ির ভোজেও জায়গা করে নিত। অবশ্য তাদের সঙ্গে চিংড়ি যোগ হয়ে তরকারির কদর আরো বাড়িয়ে দিত। আর ভাতের আয়োজনে ভাল সুগন্ধি চালের ভাত বা পোলাও বা ঘি ভাত। আলুভাজার আলুদের চেনা যেত, এখনকার মতো ফিনফিনে আকার না হলেও মুচমুচে কম ছিল না। মাংসের থেকে মাছের চল ছিল বেশী। মাংস বলতে পাঁঠার মাংস বা আজকের ভাষায় মাটন। মুরগীর মাংস খুব কম লোকেই খেত, ভোজে কাজে তো নয়ই। মাংস মানে মাংসের ঝোল। মাংসের অন্য কোনো পদের খুব একটা চল ছিল না। বরঞ্চ মাছের নানান পদ দেখা যেত। বেশী চল ছিল পাকা পোনা মাছের কালিয়া, ভাপা ইলিশ, পাতুরির। চিংড়ি মূলত বিভিন্ন তরকারির সঙ্গে যুক্ত হত। চিংড়ির নিজস্ব পদ একটাই, মালাইকারি। এই পদটি আজও অকৃত্রিম। ডিমের চলও বেশ পরের দিকে। মাছের চপ, ফ্রাই, মাংসের চপ, কাটলেট অবশ্য সব ভোজে পাওয়া যেত না। ডিম অবশ্য চপ আর ফিশ কভারেজ, যা লোকমুখে নতুন নাম পেয়েছে ফিশ কবিরাজী, বানাতে লাগে। চপ কাটলেট বানানোর জন্যও ডিমের গোলা দরকার লাগে।

শেষ পাতে কিন্তু ছিল রসগোল্লার জয়জয়কার। প্রায় প্রতিটি ভোজ বাড়িতে রসগোল্লা অবধারিত ছিল। রসগোল্লার সঙ্গীরাও ছিল লোভনীয়। কখনও তার সঙ্গে পানতুয়া, কখনও বা লেডিকেনি। কখনও এদের সবার বদলে একা রাজভোগ বা কমলা লেবুর রং আর গন্ধওয়ালা কমলাভোগ। ছোটবেলায় বাড়িতে ভিয়েন বসলে দেখতাম কমলালেবুর শুকনো খোসা হামানদিসতায় থেঁতো করে ছানার সঙ্গে মাখাতেই ছানার রং আর গন্ধ কেমন বদলে যেত। কেশরভোগ এসেছে অনেক পরে। কেশরের ব্যবহার ছিল পোলাও রান্নায়। জাফরান ফুলের শুকনো পুংকেশরকে দুধে ভিজিয়ে রাখা হত আর দুধটা কমলা রঙের হয়ে যেত। পাচক ঠাকুর পোলাওয়ের হাঁড়িতে এই দুধ ঢেলে দিত দেখতাম। তবে রসগোল্লার সঙ্গে সন্দেশের সঙ্গটাই বেশী ভালো জমতো। নরম ও কড়া দু রকম পাকের সন্দেশেরই দেখা মিলত ভোজে কাজে। বাড়িতে মিষ্টি বানানো হলে জিলিপি, অমৃতি তৈরী হত। গরম অমৃতি খাওয়ার জন্য সব খেলা ফেলে ভিয়েনে ঠায় বসে থাকতাম। এদের সঙ্গে মিষ্টি দই। অবশ্য লাল রঙের মিষ্টি দইয়ের সঙ্গে অল্প মিষ্টি সাদা দইও থাকতো কোথাও কোথাও। এই দই কোলকাতায় খুব ভালো পাওয়া যায় না, জেলার গ্রাম বা শহরাঞ্চলে এটা পাওয়া যায়, হাওড়া কোলকাতায় মিষ্টি লাল দই নয়তো সাদা টক দই।

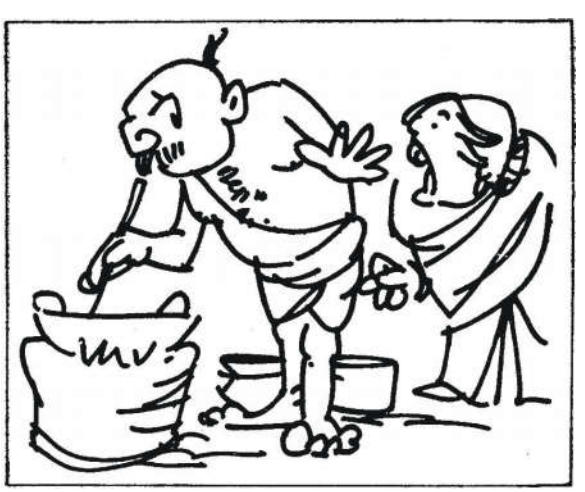

ভোজের আসল খেলোয়াড় - পাচক ঠাকুর

বিয়ে বাড়ি মানে তো শুধু বিয়ের দিনের ভোজ নয়, কদিন আগে থেকেই ভোজপর্ব চলতে থাকে। তাই শুধু ভোজের দিনের জন্য মিষ্টি হলে চলে না। দু বেলার জলখাবার আর দিন রাতের খাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি লাগবেই। তাই বেশীরভাগ ভোজ বাড়িতেই

ভিয়েন বসতো মিষ্টি বানানোর জন্য। ভোজের মিষ্টি, মূলত রসগোল্লা পানতুয়া তৈরীর পর রোজকার জলখাবারের জন্য বোঁদে বানানো হত। কেউ কেউ আবার মিহিদানা বানাতেন। অন্য মিষ্টির মধ্যে ল্যাংচা, রসমালাই, চমচমও গোটা বংলাতেই ভোজে কাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়া, স্থানীয় ভিত্তিতে যেসব মিষ্টি পাওয়া যেত সেগুলো সেই অঞ্চলের ভোজে কাজে লোককে খাওয়ানো হত। এর মধ্যে সীতাভোগ, সরপুরিয়া, মনোহরা, জোড়া মণ্ডা তো আজও জনপ্রিয়। ভাঁড়ার ঘরে পেতলের বড় বড় গামলায় পরম নিশ্চিন্তে ভেসে থাকা ছানার এইসব সুখাদ্যকে দেখতে পাওয়াটাও সৌভাগ্য।

আজকালকার মতো তখন আইসক্রিমের চল ছিল না, তবে কেউ কেউ কুলফির আয়োজন করতেন। সেটা অবশ্য গরম কালে। গরম কালের ভোজে তখন ফলের রাজা শেষ পাতে দেখা দিতেন। এখন সেভাবে আর তাকে পাওয়া যায় না, সশরীরে না থেকে তিনি নানা রূপে নিজেকে বদলে নিয়ে ভোজ বাড়িতে ঠাঁই করে নিয়েছেন। শেষের বদলে শুরুতে তাঁকে বেশী পাওয়া যায় এখন, আম পান্নার সরবত হিসাবে।

কথায় বলে বাঙালি খেয়ে আর খাইয়ে ফতুর। বাঙালির কাছে খাওয়া-পড়া দুটো আলাদা জিনিস নয়, একখানাই। তাই গুপি বাঘাকে তিনটি বর দেবে বলেও ভূতের রাজা চারটি বর দিয়ে ফেলেন। এক বরেই খাওয়া আর কাপড় চোপড়ের সমস্যা মিটে গেল। গুপি বাঘা ভূতের রাজার বরে নিত্য ভোজ খায়, কিন্তু আমাদের তো ভূতের রাজার বর নেই তাই ভোজের নিমন্ত্রণই আমাদের কাছে সেই বর।

ভোজের সব কিছু নিয়ে কথা হল কিন্তু চাটনি দিতেই তো ভুলে গেলাম। যা পেলেই মনে হয় চেটে নিই, তাই বোধহয় চাটনি। চাটনির দলে সবার ওপরে থাকবে কাঁচা আম। এই দলের অন্যরা হল আমস্বত্ত, পিনখেজুর, টোমাটো। তবে ভোজের চাটনিতে আমের পরেই বেশী গুরুত্ব পায় আনারস। তাহলে চাটনির মত একটা কৌতুকী দিয়ে লেখা শেষ করি যাতে মুখে ভোজের একটু স্বাদ থেকে যায়। এক গ্রামে এক পেটুক ভোজনরসিক ছিলেন। তার একটা বিশ্বাস ছিল ভোজ বাড়ির সেরা খাওয়াটা হয় প্রথম ব্যাচে। তাই নিজের গাঁ হোক আর অন্য গাঁ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ভোজ শুরুর অনেক আগেই পৌঁছে যেতেন। কিন্তু সেদিন কি এক কাজে বাড়ি থেকে বের হতে দেরী হয়ে গেল, যখন পৌঁছালো তখন প্রথম ব্যাচ শুরু হয়ে গেছে। মনে অত্যন্ত কষ্ট নিয়ে দ্বিতীয় ব্যাচে বসলেন এবং এমন খেলেন যে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নিমন্ত্রণ বাড়ির লোকেরা তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নদীর ধারে শুইয়ে দিয়ে এল। খোলা হাওয়া লেগে তার জ্ঞান ফিরে এল কিন্তু ওঠার শক্তি হল না। দু হাত দু দিকে ছড়াতে গিয়ে তার ডান হাতটা কিসে লাগল। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, তাই হাত বুলিয়েই বুঝল সেটা কারোর পেট, আর সেটা তার থেকেও বেশী ফুলে আছে। এ নির্ঘাত প্রথম ব্যাচে খেয়েছে তাই পেটটা এত ফুলেছে। প্রথম ব্যাচে না খেতে পারার শোক আর সহ্য করতে পারল না, হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আসলে একটা মরা গরু নদীতে ভাসতে ভাসতে এসে পাড়ে আটকে ছিল। লোকটি তার পেটেই হাত বুলিয়েছে।

আগে না হলেও আজকের বিয়ের ভোজের অন্যতম অঙ্গ 'মেনু কার্ড'। খাবারের তালিকা লেখা এই কার্ড খাওয়ার আগেই নিমন্ত্রিতদের জানিয়ে দেয় তাদের জন্য কী কী খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। তবে এই স্বাদু কিন্তু নীরস তালিকাকে সরস করার চেষ্টাও মাঝে মধ্যে হাতে আসে। পাশের মেনু কার্ডটি তারই একটি নমুনা। এই অন্যরকম মেনু কার্ডটি বানিয়েছেন তাপস বাগ। মেনু কার্ডেও যে কত বৈচিত্র আনা যায় তা দেখিয়েছেন ডা. শঙ্কর নাথ। তাঁর ছেলের বৌভাতে যে মেনু বুকলেটটি বানিয়েছিলেন তাতে যেমন খাওয়া নিয়ে হাস্যরস রয়েছে, তেমনি আছে রোগ এড়াতে কী কী খাওয়া উচিত নয় তারও সতর্কতা।

প্রদীপ
ও
প্রতিমা'র
শুভবিবাহের
প্রীতিভোজ
১৮ই মাঘ, ১৪১১
(ইং ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০৫)
মঙ্গলবার
—ঃ পরিবেশনায় ঃ—
ভাইয়া ক্যাটারার

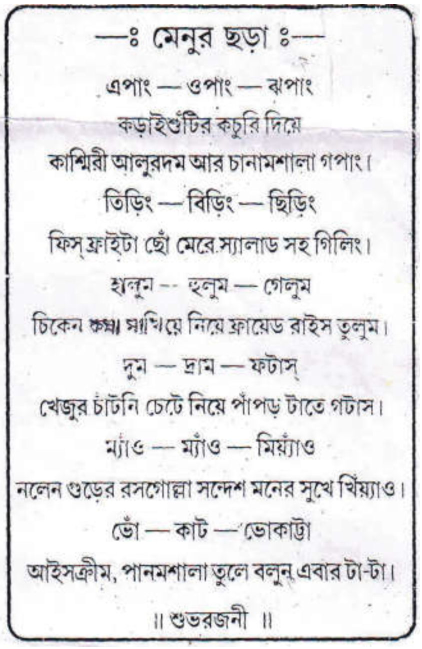

—ঃ মেনুর ছড়া ঃ—
এপাং — ওপাং — ঝপাং
কড়াইশুঁটির কচুরি দিয়ে
কাশ্মিরী আলুরদম আর চানামশালা গপাং।
তিড়িং — বিড়িং — ছিড়িং
ফিস্ ফ্রাইটা ছোঁ মেরে স্যালাড সহ গিলিং।
হালুম -- হুলুম — গেলুম
চিকেন কষা সাঁখিয়ে নিয়ে ফ্রায়েড রাইস তুলুম।
দুম — দ্রাম — ফটাস্
খেজুর চাটনি চেটে নিয়ে পাঁপড় টাতে গটাস।
ম্যাঁও — ম্যাঁও — মিয়্যাঁও
নলেন গুড়ের রসগোল্লা সন্দেশ মনের সুখে খিঁয়্যাও।
ভোঁ — কাট — ভোকাট্টা
আইসক্রীম, পানমশালা তুলে বলুন এবার টা-টা।
॥ শুভরজনী ॥

জব চার্নকের বিবাহ

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

স্থান ঃ পাটনা, সময় ঃ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের কোন একদিন বিকেলবেলা। গঙ্গার ধারে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বড় অফিস, সেখানে কাজ করছেন বেশ কিছু কর্মচারী, বেশিরভাগই স্থানীয় লোক, তাদের উর্ধতম অফিসাররা সকলেই ইয়োরোপীয়। এঁদের সকলের শীর্ষে রয়েছেন জব চার্নক সাহেব। যে সময়ের কথা বলছি, তার অন্তত চোদ্দপনেরো বছর আগে তিনি এসেছেন এই পাটনায় কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর প্রধান হয়ে; পাটনাতে তাদের সল্টপিটারের বিরাট একটি স্টোর হাউস ছিল। সে সব দেখাশোনা করা, তার গুণগত মান বজায় রাখা, ঠিকঠিক সময়ে এই রাসায়নিকটি যথাস্থানে জলপথে পৌঁছে দেওয়া, এসব চার্নক যোগ্যতার সঙ্গে নিখুঁতভাবে করতেন, তাই কোম্পানীর সুনজরে ছিলেন তিনি। সে সময় সল্টপিটারের ব্যবহার হত যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজনে। ফলে এর চাহিদাও ছিল তুঙ্গে। চার্নককে এই কারণে মন দিয়ে সল্টপিটার সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হত, নিয়মিত এই বিষয়ে পড়াশুনা করতে হত আর এই কাজটা তিনি মন দিয়েই করেছিলেন।

সেদিন তাঁর অধস্তন কর্মী প্রশিক্ষণরত একেবারে যুবক ছেলে জোসেফ টাউনসেন্ড ছুটতে ছুটতে এসে চার্নককে বললেন স্যার, গঙ্গার অপর পাড়ে আজ এই মুহূর্তে একটি সতীদাহের ঘটনা ঘটতে চলেছে, যেখানে একজন সদ্য বিধবা হিন্দু মেয়ে তাঁর স্বামীর চিতায় নিজেকে জীবন্ত আত্মাহূতি দেবেন, যাবেন স্যার দেখতে? জব চার্নক রাজি হয়ে গেলেন, এমন ঘটনার কথা শুনেছেন তিনি, কিন্তু চাক্ষুষ করবার সুযোগ হয়নি কোনদিন।

নৌকা প্রস্তুত করা হল, সেখানে টাউনসেন্ড এবং চার্নক বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উঠালেন, সঙ্গে নিলেন আরও কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী।

ঐ তো দেখা যাচ্ছে, গঙ্গার পাড়ে চিতা সাজানো হচ্ছে। আশেপাশে বহু মানুষ জমায়েত হয়েছে; ঢাক-ঢোল-করতাল-শিঙ্গা বাজানো হচ্ছে। চার্নক সঙ্গীসাথী নিয়ে খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে সে সব নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

মৃত স্বামীর চিতায় আগুন জ্বালানো হল, ধীরে ধীরে সে আগুন লেলিহান শিখা নিয়ে জ্বলতে লাগলো দুরন্ত হাওয়ায়।

সদ্য বিধবা মেয়েটির বয়স কত আর হবে, বছর পনেরো - অপরূপা সুন্দরী, লম্বা, ফর্সা, দারুণ দামী শাড়িতে তাঁকে আরও উজ্জ্বল লাগছে, চোখ - নাক যেন ছবির মত আঁকা। চিতার আগুনের খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ হিন্দু মেয়েটি। লেলিহান আগুনের আলোতে পড়ন্ত বিকেলের পটভূমিকায় মেয়েটিকে আরও রূপময়ী করে তুলেছে। চার্নকের চোখে এ-সব বর্ণনাতীত মনে হতে লাগলো। আত্মোৎসর্গের আগে ব্রাহ্মণেরা শুরু করে দিয়েছে পূজা-অর্চনা, মন্ত্রোচ্চারণ, আর স্বামীর চিতার আগুনের দিকে মুখ করে অর্ধনিমীলিত চোখে সেই মন্ত্র বিড় বিড় করে বলে যেতে লাগলেন মেয়েটি, যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন।

চার্নক কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না, ভগবানের হাতে সৃষ্ট এই স্বর্গীয় রূপের অধিকারী মেয়েটি একটু পরেই লেলিহান চিতায় ভস্মীভূত হয়ে যাবে। বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি, মনে হল এটা সৃষ্টির অবমাননা, এঁকে বাঁচাতে হবে, এঁকে আমার আপন করে নিতে হবে। না আর বোধ হয় অপেক্ষা করা যায় না, দেরি করলে সেই নৃশংস ঘটনাটি ঘটে যাবে, মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়বে, অথবা তাঁকে জোর করে চিতার আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

জবচার্নক নির্দেশ দিলেন টাউনসেন্টকে, ''জো, ব্রাহ্মণদের

আক্রমণ করো, ছত্রখান করে দাও।”

একসঙ্গে গর্জে উঠলো সব আগ্নেয়াস্ত্র। প্রাণ বাঁচাতে ছত্রখান হয়েগেল, বিদ্যুৎগতিতে, চার্নক ছুটে গিয়ে অর্ধচেতন মেয়েটিকে তাঁর শক্ত বাহু দুটি দিয়ে তুলে নিয়ে পৌঁছে গেলেন নৌকাতে। ইতিমধ্যেই নৌকায় চার্নকের অন্যান্য সঙ্গীরাও চলে এসেছেন।

তখন সন্ধ্যে নেমে গেছে, পৃথিবী ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। সকলে ফিরে এলেন কোম্পানীর অফিসে। কর্মচারীদের কেউ কেউ বললেন, চার্নক সাহেব খুব বড় একটা মহৎ কাজ করলেন; আবার কেউ কেউ বললেন, এই কাজ হিন্দুরা অনুমোদন করবে না, ফলে হিন্দুদের সঙ্গে কোম্পানীর ব্যবসায় খানিকটা চিড় খেতে পারে। কিন্তু চার্নক কোন কথাই আমল দিলেন না, মেয়েটির জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত উদ্বেগের মধ্যেই রইলেন। ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে শুশ্রূষা করছেন মহিলা কর্মচারীরা আর ঘরের বাইরে বসে আছেন একরাশ উদ্বেগ নিয়ে চার্নকসহ গোটা দল।

খানিকটা সময় কেটে যেতে যেই মাত্র মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসার খবর চার্নকের কাছে এল, তক্ষুনি তিনি ছুটে ঘরে ঢুকে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে নিজের এই কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। মেয়েটিও বললেন যে, বিদেশীর স্পর্শে তিনি যেহেতু অশুচি হয়ে গেছেন, তাই এরপরও তাঁর আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, হিন্দু সমাজ তাঁকে বাঁচতে দেবে না। এই কথায় চার্নকের উদ্বেগ আরও বাড়লো।

ইত্যাবসরে খবর এলো, এই তথাকথিত “ন্যাক্কারজনক” কৃতকর্মের জন্য প্রশাসন চার্নককে খুঁজছে গ্রেপ্তার করবে বলে। কোতয়াল বাহিনী পাটনার ফ্যাকটরীর দিকে আসছে।

এই খবর শুনে শুভানুধ্যায়ী উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী খাবার দাবার, কাপড় চোপড়, তাঁবু কিছু অগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চার্নক মেয়েটিকে নিয়ে নৌকায় চেপে বসে চললেন লালবাগের দিকে। লালবাগে পৌঁছে নদীর তীরে এক জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে ভেতরে থাকতে শুরু করলেন মেয়েটি আর বাইরে গাছতলার নীচে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে চার্নক পাহারাদারের মত অবস্থান করতে শুরু করলেন। এই ভাবেই কেটে গেল বেশ কয়েকদিন। অবশেষে দু'জনেই ঠিক করলেন এভাবে থাকা যায় না, দু'জনে বিয়ে করবেন।

সেই মত একদিন উষাকালে উভয়েই গঙ্গায় স্নান করে নতুন পোষাক পরিহিত হয়ে বৃক্ষরাজির নীচে এসে দাঁড়ালেন মুখোমুখি। আর তারপর মেয়েটির নিজ হাতে তৈরি বুনো ফুল আর পাতার দ্বারা নির্মিত দুটি মালা একে অপরের গলায় পরিয়ে দিলেন। ওঁদের বিয়ে হল গান্ধর্ব মতে, সাক্ষী রইলো আকাশ-বাতাস, সূর্য, বৃক্ষরাজি, ফুল-ফল, বনের অসংখ্য পাখী আর ঐ যে আবহমানকাল ধরে বয়ে চলা গঙ্গা। জব চার্নক সেদিনই মেয়েটির নাম দিলেন অ্যাঞ্জেলা, কিংবা লীলা। চার্নকের পরামর্শেই কিন্তু লীলা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন না, বরং লীলার পরামর্শে চার্নক কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া থেকে বিরত হলেন, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

এদিকে চার্নকের কাছে তার কয়েকদিন পরেই খবর এল, চার্নকের এহেন গর্হিত কর্মকান্ডটি প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা হয়েছে এবং তা আপসে মীমাংসাও হয়ে গেছে; এর জন্য চার্নকের পক্ষ থেকে দিতে হয়েছে ৩০০০টাকা, পাঁচখানি উৎকৃষ্ট মানের কাপড় এবং কিছু তলোয়ার। ফলে চার্নকের ফ্যাকটরী থেকে সমস্ত কোতয়ালদের তুলে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এবার চার্নকের আর কোন অসুবিধাই রইল না স্ত্রী লীলাসহ পাটনায় ফিরে আসতে। (১)

এতক্ষণ আমরা শুনলাম দারুণ একটি রোমহর্ষক বিবাহের কাহিনী, যা গল্পের মতো, স্বপ্নের মতো, ঘটেছিল আজ থেকে ৩৩৭ বছর আগে। জব চার্নকের সঙ্গে বিয়ে হল এদেশের এক মেয়ের সঙ্গে। তাঁর নাম ইতিহাসে উল্লিখিত নেই। ঔপন্যাসিক ডঃ প্রতাপচন্দ্র মেয়েটির নাম দিয়েছেন অ্যাঞ্জেলা, সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ নাম দিয়েছেন লীলা। মুরহাউস আর ডেসমন্ড ডয়েগ বলেছেন মারিয়া।

জব চার্নক সম্পর্কে বলা হয়, তিনি ছিলেন কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা; প্রতিষ্ঠার সময় ছিল, ১৬৯০ সালের ২৪ আগষ্ট, কিন্তু কলকাতাকে কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রতিষ্ঠা করার তত্ত্ব খারিজ হয়ে গেছে আজ। তবে একথা ঠিক, কলকাতার প্রারম্ভ, সূচনা, উন্নয়নের ছোঁয়া এবং ঘাতের পিছনে জব চার্নকের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতাতেই মারা যান ১০ জানুয়ারী ১৬৯২ নাকি ১৬৯৩ সালে এবং তাঁকে কবরস্থ করা হয় কলকাতার বি.বা.দী. বাগ এলাকায় সেন্ট জনস্ গীর্জার প্রাঙ্গণে। মৃত্যুর কয়েক বছর পর কবরের উপর তাঁর বড় জামাই চার্লস আয়ার একটি সুন্দর সৌধ নির্মাণ করে দেন, যা আজও অটুট।

চার্নক ভারতে এসেছিলেন সম্ভবত ১৬৫৫-৫৬ সালে। যতদূর জানা যায়, কোম্পানীর কাজ নিয়ে আসেননি, কিন্তু এখানে এসে পাঁচ বছরের জন্য পেয়ে যান কোম্পানীর কাজ কাশিমবাজারের কাউন্সিলের জুনিয়র সদস্য হিসেবে। চার্নকের পারিবারিক ইতিহাস

জানা যায় না। কেবল জানা গেছে, তিনি ল্যাংকাশায়ারের অধিবাসী ছিলেন। কাশিমবাজারে তিনি কাজে যোগ দেন ১৬৫৭ বা ১৬৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে, বেতন মাসে ২০ পাউন্ড।

পাঁচ বছর কাজের শেষে ১৬৬৪ সালে তিনি ইংলন্ডে ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। কোম্পানীকে শর্ত দিলেন, ভারতে থাকতে পারেন যদি তাঁকে পাটনা-অফিসের প্রধান পদে নিয়োগ করা হয়।

তিনি সেই পদ পেয়েছিলেন এবং পাটনায় কোম্পানীর অফিস সামলেছেন যোগ্যতার সঙ্গে একেবারে ১৬৮০ সাল পর্যন্ত। পাটনায় থাকাকালীনই তাঁর বিয়ে হয়, যা আগেই বলেছি। এই সময়ের মধ্যে তিনি ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করেন, এদেশের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে পরিচিত হন, এদেশের সংস্কারগুলিকে মেনে চলতে শুরু করেন, এমনকি ''পাঁচ-পীর''-এর আরাধনা করাও বাদ দেননি। (২)

চার্নকের স্ত্রী ১৬৯২ এর আগেই মারা যান। মনে করা হয় যে, চার্নক তাঁর স্ত্রীকে ঐ সেন্ট জনস্ গীর্জার প্রাঙ্গণেই সমাধি দেন (যেখানে তাঁর নিজের সমাধি রয়েছে, সেখানেই)। অবশ্য এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

এবার আমরা দেখে নেবো, চার্নকের সমসাময়িক কাল বা তার কিছু পরে চারজন ব্যক্তির বক্তব্য। তাঁরা চার্নকের এই বিবাহ সম্পর্কে কি লিখেছেন বা কি মত দিয়েছেন অথবা কি ধারণা পোষণ করতেন। ইতিহাসের উপাদান ঘেঁটে অবশ্য এটা জানা গেছে, চার্নক এদেশের মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের কয়েকটি সন্তান হয়, তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের নামে কোথাও কোন কলঙ্ক-কাহিনী নেই বরং সকলেই ইংরেজ সমাজে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন, সমাদৃত ছিলেন।

চারজন বক্তা হলেন উইলিয়াম হেজেস, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, এডওয়ার্ড লিটল্টন এবং জন জেফানিয়া হলওয়েল। (৩)

হেজেস কী বললেন ঃ প্রথমেই বলে রাখি উইলিয়াম হেজেসের সঙ্গে চার্নকের কিন্তু মধুর সম্পর্ক ছিল না। হেজেস নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। ১৬৮২ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ঢাকায় ছিলেন। ১ ডিসেম্বর তিনি লিখছেন ঃ

> ''আমি রে নন্দলালের কাছে জেমস্ প্রাইসকে পাঠালাম। আজ সকালে হুগলী এবং কাশিমবাজারের গভর্নর বুলচাঁদ এক ভদ্রলোককে আমার কাছে পাঠালেন। তিনি আমার কাছে অভিযোগ করলেন যে, মিঃ চার্নক এমন লজ্জাকর কান্ড করেছেন যে, আমাদের জাতির উপর তা কলঙ্ক লেপন করে দিয়েছে। মিঃ চার্নক ১৯ বছর ধরে একজন এদেশীয় মহিলাকে রক্ষিতা করেন রেখেছে। আমি যদি ঐ রক্ষিতাকে তাড়িয়ে দিতে না পারি, তাহলে নবাবের কাছে নালিশ করবো, যাতে আমাদের জাতের কলঙ্ক আর বৃদ্ধি না হয়। সেই সময়ের মতো আমি লোকটিকে ভালো ভালো কথা বলে ঠান্ডা করলাম।
>
> এই ভদ্রলোক এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন লোক আমাকে জানালেন যে, নবাবের কাছে নালিশ করা হয়েছিল যে, চার্নক পাটনায় থাকাকালীন একজন হিন্দু মহিলাকে রক্ষিতা রেখেছিলেন (যাঁর স্বামী এখন জীবিত অথবা সদ্য প্রয়াত)। সেই মহিলা তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে এবং স্বামীর সমস্ত টাকাপয়সা, মূল্যবান মনিমুক্তো সব চুরি করে নিয়ে এসেছে। এই কারণে নবাব ১২ জন সিপাই পাঠিয়েছিলেন চার্নককে পাকড়াও করবার জন্য। কিন্তু চার্নক পালিয়ে যান (অথবা ঐ লোকগুলিকে ঘুষ দিয়ে) এই কারণে চার্নকের উকিলকে ধরে তারা ২ মাস জেলে পুরে দেয়। সিপাইরা সারাদিন রাত ফ্যাকটরীর গেটের সামনে বসে থাকতে শুরু করে। এরপর চার্নক কর্তৃপক্ষকে ৩০০০ টাকা, পাঁচটি বড় কাপড় এবং বেশ কিছু তলোয়ার উপহার দিয়ে আপসে এসব মিটিয়ে ফেলেন। আমি শুনেছি কাশিমবাজারে এমন ঘটনা তাঁর অনেকবার ঘটেছে। এই মেয়েটির অথবা চার্নকের মৃত্যু ঘটলে কোম্পানীর বেশ বদনাম হয়ে যাবে।'' (৪)

হেজেসের কথা অনুযায়ী তাহলে দাঁড়াচ্ছে চার্নকের বিয়ে নাকি হয়েছিল ১৬৬২ সালে। ইতিহাস তা একেবারেই সমর্থন করে না। তিনি যে রক্ষিতা রেখেছিলেন তার প্রমাণ কোথাও নেই। তাঁর নামে কোন কলঙ্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি। হেজেস তাঁর অভ্যাসবশত চার্নকের চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করেছেন।

হ্যামিলটন কী বললেন ঃ প্রথমেই বলে রাখি দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন কিন্তু কারোর ভালো দেখতে

পারতেন না, তেমনই কারো সম্পর্কে কোন ভাল কথাও বলতেন না, বরং কুৎসা করতে ভালবাসতেন। এবার দেখি তিনি চার্নক সম্পর্কে কি বলেছেন। তিনি অবশ্য ''সতী-থিয়োরী''-তে বিশ্বাস করেছেন। ১৭২৭ সালে প্রকাশিত তাঁর A New Account of the East Indies (Vol II)-তে তিনি লিখছেন ঃ

> "The Country about being overspread with Organism, the Custom of Wives burning with their deceased Husbands, is also practised here. Before the Mogul's War, Mr. Channoch was one Time with his ordinary Guard of Soldiers, to see a young Widow act that tragical Catastrophe, but he was so smitten with the Widow's Beanty, that he sent his Guards to take her by Force from her Executioners, and conducted her to his own Lodgings. They lived lovingly many Years, and had several Children, at length. She died, after he had settled in Calcutta, but instead of converting her to christianity, she made him a Proselyte to Paganism, and The only Part of Christianity that was remarkable in him, was burying her decently, and he built a Tomb over her, Where all his Life after her Death, he kept the anniversary Day of her Death by sacrificing a Cock on her Tomb, after the Pagan Manner; this was and is the common Report, and I have been credibly informed, both by Christians and Pagans, who lived at Calcutta under his Agency, that the Story was really true Matter of Fact." (৫)

অর্থাৎ কিনা, এক হিন্দু সতীদাহর অনুষ্ঠান থেকে এক বিধবা মহিলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সিপাইদের সাহায্যে মেয়েটিকে জল্লাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন চার্নক এবং নিজের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেন তাঁর সঙ্গে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বহু বছর। তাঁদের কয়েকটি সন্তানও হয়। মহিলাটি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হননি, বরং চার্নকই পৌত্তলিকতায় দীক্ষিত হয়ে যান ঐ মহিলার প্রভাবে। অল্পখানিকটা খৃষ্টানত্ব যা ছিল চার্নকের মধ্যে, তার বশবর্তী হয়েই মহিলার মৃত্যুর পর তাঁকে তিনি কবরস্থ করেন এবং প্রতিবছর মৃত্যুদিনে তাঁর কবরের উপর একটি করে মোরগ উৎসর্গ করতেন।

বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে চার্নকের বিয়ে, নাকি একত্রে স্বামী-স্ত্রীর মত থাকা সম্পর্কে এসব কথা বললেও হ্যামিলটন কিন্তু একটা কথা স্বীকার করেছেন যে, চার্নক এক হিন্দু মহিলাকে জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে, অবৈধ সম্পর্ক না ঘটিয়েও স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রা পালন করে গেছেন।

এডওয়ার্ড লিটলটন কী বললেন ঃ এবার দেখি এডওয়ার্ড লিটলটন কি বলেছিলেন চার্নক সম্পর্কে। লিটলটন ভারতে এসেছিলেন ১৬৭১ সালে কাশিমবাজারের ফ্যাকটরীর প্রধান হয়েছিলেন। চার্নককে তিনি বহুদিন দেখেছেন, তাঁর স্ত্রীকেও তিনি দেখেছেন একই ভাবে। একটা বিভ্রান্তিকর তারিখযুক্ত লম্বা চিঠিতে ''হুগলী ১৬ই নভেম্বর ১৬০০'' লিখে লিটনটন ইংরেজ কোম্পানীর কোর্টকে লিখছেন ঃ

> "............ taking JENTUES meet often with great trouble alsoe, tho' but very poor people having all of them Husbands very early, who tho' they Cohabit not, yet on such occasion apply to the Government Where its never ended but with great change and trouble. As in the case of Mr. JOB CHARNOCK and the Woman bee kept tho' of a meane Cast, and great proverty which occasioned great trouble and charge to the Company a long while at PATTANA and afterwards some alsoe at CASSIMBUSSAR." (৬)

লিটলটন এখানে চার্নক সম্পর্কে হেজেসের কুৎসা এবং হ্যামিলটনের সতী তথ্যকে মানতে চাননি, শুধু বলেছেন, চার্নক এদেশীয় এক অতি নিচু শ্রেণীর হতদরিদ্র মেয়েকে নিয়ে থাকতেন, যার ফলে কোম্পানী বেশ সমস্যায় পড়েছিল।

হলওয়েল কী বললেন ঃ জন জেফানিয়া হলওয়েল (১৭১১ - ১৭৯৮) ১৭৬৭ সালে তাঁর লেখা "Interesting Historical Events Relative to The Province of Bengal ....." পুস্তকে চার্নক সম্পর্কে কি লিখেছেন দেখা যাক ঃ

> "Before we close this subject, we will mention one or two more particulars relative to it. -- It has been already remarked in a marginal note, that the Gentoo women

are not allowed to burn, without an order of leave from the Mahommedan government; it is proper also to inform our readers this privilege is never withheld from them. --- There have been instances known, when the victim has, by Europeans, been forceably rescued from the pile; it is currenlty said and believed (how true we will not aver) that the wife of Mr. Job Charnock was by him snatched from this Sacrifice; be this as it may, the outrage is considered by the Gentoos, an atrocious, and wicked violation of their sacred rites and privileges." (৯)

হলওয়েল কিন্তু সামান্য সন্দেহকে মনে রেখেও বলতে চেয়েছেন যে, চার্নক সতীদাহর অনুষ্ঠান থেকেই এক হিন্দু মহিলাকে উদ্ধার করে এনে বিয়ে করেছিলেন (Kept নয় তিনি wife কথাটি লিখেছেন)।

জব চার্নকের বিবাহ সম্পর্কে যতই ভিন্নমত থাকুক না কেন, এদেশের বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করেন চার্নক সতীদাহর অনুষ্ঠান থেকে অল্পবয়সী এক বিধবা হিন্দু মেয়েকে উদ্ধার করে এনে বিয়ে করেছিলেন, সম্ভবত ১৬৭৮ সালে এবং তাঁদের সন্তানসন্ততি হয়েছিল কয়েকজন। চার্নকের তিন মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষের সঙ্গে। প্রথমা কন্যা মেরির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল চার্লস আয়ার-এর। ইনিই চার্নকের সমাধিটি নির্মাণ করে দেন। মেরির মৃত্যু হলে (১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৬৯৭) সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়।

চার্নকের দ্বিতীয় কন্যা এলিজাবেথ-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল উইলিয়াম বাউরিজ-এর। এলিজাবেথ বেঁচেছিলেন কলকাতাতেই ১৭৫৩ সাল পর্যন্ত।

চার্নকের তৃতীয়া কন্যা ক্যাথরিন বিয়ে করেছিলেন কোম্পানীরই জোনাথন হোয়াইট-কে। ক্যাথরিন মাত্র ১৯ বছর বয়সে সন্তানধারণকালে মারা যান কলকাতাতেই ২১ জানুয়ারি ১৭০০ অথবা ১৭০১ সালে। তাঁকে কবরস্থ করা হয় সেন্ট জনস্ গীর্জা প্রাঙ্গণে, তবে সেখানকার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে নয়।

জানা যায় জবচার্নকের একটি পুত্র সন্তানও ছিল, সে ছিল সকলের ছোট, কিন্তু শিশুবয়সেই সে মারা যায়।

শেষে বলা দরকার, চার্নকের বিবাহ এবং তাঁর নিজের পারিবারিক ঘটনাগুলির অধিকাংশটাই গল্প কাহিনীর উপর ভরসা করেছেন মানুষ, আজও করেন। তাই গবেষকদের কাছে আবেদন করবো যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপকরণের উপর ভিত্তি করে এ বিষয়ে সত্য ইতিহাস উদ্ঘাটন করতে।

ঃ তথ্যসূত্র ঃ

(১) ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও সুবোধ ঘোষের লেখা, (২) Job Charnock's Hindu wife : A Rescued Sati by Hari Charan Biswas, Hindustan Review, Sept. 1910, Vol. 22, pp 298-301., (৩) কলকাতার সৃষ্টি ও জব চার্নক - পি.টি. নায়ার, ১৯৮৪, পৃ. ৯৮, (৪) The Diary of William Hedges, Vol. I, by H.Yule, 1887, p.52., (৫) A New Account of the Eaxt Indies ...., Alexander Hamilton, Vil.II, 1727, p.8-9., (৬) The Diary of William Hedges, Voll. II, by Yule, 1888, p. 209., (৭) Interesting Historical Events, Relative to the Provinces of Bengal ...... by J.Z. Holwell, part II, 1767, pp 99-100.

M/S Techno Fabricating Concern

Shanpur Bhagwan Das Math, P.O.- Dasnagar, Howrah-711105

Manufacturing of Impeller, Ducting, Casing, Chassis, Floor Plate, Gear Box etc.

Contact with -- Radha Raman Hazra & Kamalesh kumar Manna

Ph. - (033) 2667-6926

উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যে বিধবা বিবাহের সামাজিক ব্যাকরণ

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বিধবা চরিত্রের বিশেষ ভূমিকা পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রত্যক্ষ ফল, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবধারাপুষ্ট বাঙালি মানসের নবজাগরণের ফল। উনিশ শতকের বাঙালি মানস ও মননশীলতায় পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই জয়গান ঘোষণার প্রেক্ষাপটে কুসংস্কার মুক্ত বাঙালি মানস যে সমস্ত সামাজিক সমস্যাকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ তার মধ্যে অন্যতম। ফরাসী বিপ্লবোত্তর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিল্প বিপ্লবের ঢেউ এ দেশের শিক্ষিত সমাজের মনে যে ভাবআন্দোলনের সৃষ্টি করে, তার ফলে একদিকে কুসংস্কারাবদ্ধ প্রাচীনরা যেমন হায় হায় শুরু করলেন ঃ

> ‘গেল গেল সব গেল জাতি, ধর্ম, শিক্ষা,
> লোকাচার, দেশাচার সব কিছুই শেষ হলো’।

অপর দিকে তেমনি পাশ্চাত্যের গুণমুগ্ধরা প্রচার করতে শুরু করলেন; মানুষের মত বাঁচতে হলে এসমস্ত ধারণা পরিত্যাগ করতে হবে। বিলাতের লোকেরা সভ্য এবং তারা যে আচার ব্যবহারের ফলে সভ্যতার মানদন্ডে নিজেদের উন্নত করেছে, সে সব আচার ব্যবহার, রীতি নীতি আমাদেরও গ্রহণ করতে হবে, না হলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে যেতে হবে সকলকে। বস্তুত সমাজের এই বিক্ষুব্ধ দ্বন্দ্ব ও আলোড়নকে নিয়েই একালে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ। ভাব, ভাষা, আঙ্গিক, কলাকৌশল ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যের এ ক্রমবিকাশ মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ সমাজ ব্যবস্থার বিধবারা হলেন অন্যতম প্রধান বিষয়।

অনেকদিন আগে থেকেই এ দেশের বিধবারা ধর্মের নামে অসহনীয় জ্বালা ও অপমানের শিকার হয়ে আসছিলেন। কী কারণে, কবে থেকে এবং কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজে বিধবাদের জন্য এ জাতীয় শাস্তির প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, তা জানা না গেলেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্বে এদেশে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু কালক্রমে শাস্ত্রবিদ্দের দ্বারা বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়।

ইসলামিক সভ্যতা বিকাশের পর্বে আলোচ্য প্রথার মূলে একটা ফাটলের সৃষ্টি হয়; কিন্তু ছয়শত বছরের দীর্ঘকালপরিসরে সে ফাটল খুব একটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা রাজবল্লভ বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিক্রমপুরের পন্ডিতসমাজ এ ব্যবস্থা অনুমোদন করলেও নবদ্বীপের পন্ডিত সমাজ এতে সম্মতি দান না করায় রাজা রাজবল্লভের প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা যেমন স্মরণীয় তেমনি সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা অনন্য। তদানীন্তন সমাজচিন্তাকে ভাষায় রূপায়িত করার জন্যই তাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন। তদানীন্তন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মের লোকাচার ও দেশাচারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে আধুনিক মননশীলতার ছাঁচে বাঙালি মানসকে গড়তে চেয়ে উভয়েই বাংলা গদ্যকে বাহন করেছিলেন। রামমোহন রায় আধুনিক ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। ১৮২৭ সালে তিনি কলকাতায় ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেন এবং তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সরাসরি হিন্দু সমাজব্যবস্থাকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। সমাজপতিদের দ্বারা তিনি নাস্তিক আখ্যায় অভিহিত হলেও হাল ছাড়েন নি। তাঁর ব্যাপক আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহায়তায় দীর্ঘদিনের সতীদাহ প্রথা রহিত হয়।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুই বিদ্যার বা দয়ার সাগর নন, তিনি একদিকে বাংলাগদ্যের স্থিতিশীল রূপ প্রদানের অকুণ্ঠ পরিশ্রমী গদ্যশিল্পী; আর অন্যদিকে সমাজ অবহেলিত মানুষের বেদনা দূরীকরণে নিরলস সমাজকর্মী। রামমোহনের মতো তিনিও ছিলেন মানবতাবাদী সারস্বত। উভয়েই প্রাচ্য মনীষার দৃঢ় ভিত্তির উপর পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেখানে তাঁদের সমাজচিন্তা ও নির্দেশ ছিল অভ্রান্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনে অভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্রতী হয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করলেন —

> ‘বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না’ এবং ‘বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না’।

বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণই আলোচ্য গ্রন্থদুটির উদ্দেশ্য। তিনি ‘পরাশর সংহিতা’ থেকে শাস্ত্রীয় প্রমাণও উদ্ধার করে প্রদর্শন

করেছিলেন —

‘নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।’

অর্থাৎ পতি নষ্ট (অনুদ্দিষ্ট), মৃত, প্রব্রজ্যাশ্রমস্থ, ক্লীব বা পতিত হলে — এই পাঁচ প্রকার বিপন্ন অবস্থায় স্ত্রীলোক পুনরায় বিবাহ করতে পারে। এর প্রতিবাদ করে প্রসন্নকুমার শর্মা লিখলেন — ‘বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ।’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক উদ্ধৃত পরাশর সংহিতার বচন সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা বললেন — পরাশর সংহিতার বচন বিবাহিতা রমণী সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়; কেবলমাত্র বাগদত্তা কন্যা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ উক্ত অবস্থায় একমাত্র বাগদত্তা কন্যারাই পতিগ্রহণ করতে পারে; বিধবারা নয়। এ সমস্ত বাদবিতন্ডা - বিতর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে ছিলেন তৎকালীন পন্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্যবৃন্দ। অপরপক্ষে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রমুখ পন্ডিতবর্গ।

এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয় আংশিক সফল হলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ইংরেজ সরকার বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করেন। এবং বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত সন্তান বৈধ সন্তান বলে প্রতিপন্ন হবে এবং পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে — এ মর্মেও আইন পাস করা হয়।

১৮৭৮ শকাব্দে এ দেশের মাটিতে প্রথম বিধবা বিবাহ সংঘটিত হলো। ১৮৭৮ শকাব্দের ২৩ অগ্রহায়ণ রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে পলাশডাঙা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছর বয়স্ক বিধবা কন্যা কালীমাতা দেবীর বিবাহ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এগারো বছর বয়স্ক বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এর পরে আরো অনেক বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের পন্ডিত মূর্খ, সম্ভ্রান্ত - অসম্ভ্রান্ত সকলেই তাঁর উপর এমন খড়্‌গহস্ত হয়ে উঠেছিল যে, কেউ কেউ তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ সর্বজনসম্মত স্বীকৃতি লাভ করেনি। বিধবা বিবাহ সমস্যা, আইন প্রচলন, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ইত্যাদি সমাজের বুকে নানা প্রতিক্রিয়া, আলোড়নের সৃষ্টি করলেও এবং শেষ পর্যন্ত সর্বজনীন স্বীকৃতি না পেলেও সমসাময়িক কালের সাহিত্যকর্মে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গটি এ প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ পরিগণিত হবে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য দিকের তুলনায় নাট্য আন্দোলন এই সময় জোরদার হয়ে ওঠে। সমসাময়িক নাটকেই বিধবা প্রসঙ্গের প্রথম সূত্রপাত হয়। সেকালে বিধবা বিবাহ সরস ও বিরস আলোচনার প্রধান বিষয় বস্তু হয়ে ওঠায় নাটকে তা রূপায়িত হয় এবং এ প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখযোগ্য উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত ‘বিধবা বিবাহ’ নাটক। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হলে উক্ত নাটকটি বহুবার মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। কীর্তিরাম ঘোষ নামক জনৈক গৃহস্থের বিধবা কন্যা সুলোচনার প্রেম ও তার বিয়োগান্ত পরিণতি নাটকটির মূল বক্তব্য। বাংলা ভাষায় এটি প্রথম বিয়োগান্ত নাটক এবং এর নায়িকা একজন বিধবা।

বিধবা বিবাহের সমর্থনে আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক শিমূরেল পিরবক্সের লেখা ‘বিধবা বিবাহ’ নাটক (১৮৫৯)। আবার বিধবা বিবাহে অসম্মতিজ্ঞাপক কিছু লেখা হয় নি, এমন নয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত প্রগতিবাদী নাট্যকাররাও শতাব্দীর শেষের দিকে বিধবা বিবাহের ক্ষতিকর দিকটির প্রতি অলোকপাত করে বিধবা বিবাহ বর্জনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘শাস্তি কি শাস্তি’ (১৯০৮) নাটকটির উল্লেখ করা চলে। আবার মনোমোহন বসুর ন্যায় প্রাচীনপন্থী নাট্যকারও বিধবা বিবাহ সমর্থন না করে পারেন নি। তাঁর রচিত ‘আনন্দময় নাটক’ এর সাক্ষ্য বহন করে।

নাটকের পরই বাংলা কবিতার নবযুগের ভগীরথ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে (১৮৬১) বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। আলোচ্যকাব্যে এগারো জন বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন মানসিকতার নারী প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই এগারোজনের মধ্যে একজন বাল্যবিধবা শূর্পনখা — যে রামানুজ লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করেছে। উভয়েই হিন্দু আদর্শ উদ্ভুত রামায়ণের চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদন শূর্পনখার মুখ দিয়ে যে ঘোষণা করলেন তা যেন পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতায় দীক্ষিতা নারীর উক্তি;

প্রেমাধীনা নারীকুল ভবে কি হে দিতে
জলাঞ্জলে, মঞ্জুকেশি, কুলমান ধনে
প্রেমলাভ লোভে কভু? ....

এর সঙ্গে পরবর্তী শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের 'কিরণময়ীর' উক্তির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারেঃ 'ভালবাসা পাপ নয়, সমাজের দম্ভ যদি নরনারীর প্রেমকে স্বীকার করে না নেয়, তা হলেই তাকে অবৈধ বলা যায় না।'

কাব্যের পর বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস শাখার উদ্ভব এই সামাজিক আন্দোলন আলোড়নের পথ বেয়ে। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের বিবর্তনের পথরেখা বাংলা উপন্যাসে চিত্রিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এই প্রথম দশকে সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ও গণমানসে এর প্রতিক্রিয়াজাত সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে ঔপন্যাসিক মূল্যবোধ বঙ্কিচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' সেই প্রয়াসেরই যোগফল। সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয় তাহলে 'বিষবৃক্ষ' নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার সমসাময়িককালের সমাজজীবনের দর্পণ। এ দর্পণে সমসাময়িককালের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা রূপে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে যে চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে, তাতে রূপায়িত হয়েছে বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রেম ও বিবাহজাত সমস্যা।

পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের 'করুণা', 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গে'র বৃত্ত অতিক্রম করে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পর্যন্ত - এ সমস্যা সমসাময়িক সময়ের অন্যতম সমস্যা। এই সমস্যার পথ ধরেই সামাজিক মূল্যবোধের বিবর্তনের ধারা যেমন প্রতিফলিত তেমনই ভাবে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস শাখার প্রসার ও সমৃদ্ধি।

রাখি ও গুলজারের বিবাহে কন্যাদান করছেন শচীন দেববর্মন

নাতনী পুপের বিবাহে পৌরহিত্য করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিয়ের ছবি, ছবিতে বিয়ে

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এ তোলা শচীন কর্তা ও মীরা দেববর্মনের বিবাহের ছবি

১৭৯৯ সালে শিল্পী বালথাজার সলভিন্সের রঙিন এচিং ছবিতে বাঙালী বিবাহ

বি বা হ বি চি ত্রা

কালীপদ চক্রবর্তী

(বর্তমান - ৩১ মে ২০০৯ থেকে সংকলিত)

প্রায় সকলেই চায় তাদের বিয়ের দিনটিকে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখতে। তাই বিয়ের আয়োজনগুলোতে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা হয়। কিছু কিছু বিয়ের অনুষ্ঠান আছে যেগুলো স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির বিয়ের প্রথাতে বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য দেখা যায়। আমাদের কাছে সেগুলো বিচিত্র প্রথা মনে হলেও সেগুলো তাদের কাছে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

সাবমেরিনে বিয়ে

ইংল্যান্ডের নৌবাহিনীর চিফ পেটি অফিসার ক্রিস ট্যন্ডি বিয়ে করেছিলেন স্কুল শিক্ষিকা ইভা ড্রাইভারকে। তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানটি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করা একটি সাব মেরিনের ভেতর।

দোকানে বিয়ে

নিউইয়র্কের গ্যারেট কভার্ট ও ক্যারি রাইট কাজ করতেন একটি দোকানে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিয়ের আয়োজনটি সম্পন্ন করেন এই দোকানের মধ্যেই। বিয়েতে তাৎক্ষণিক অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রায় শ'খানেক ক্রেতা।

অন্য একটি ঘটনা কানাডার টরেন্টো শহরের একটি বইয়ের দোকানে প্রথম সাক্ষাৎ হয় নাথালি মেইজার ও ম্যাট রোহারের। এর বছর তিনেক পর তাঁরা সেই বইয়ের দোকানেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এভারেস্টের চূড়ায় বিয়ে

পাত্র নেপালের পেম দোরজে শেরপা (২৩) আর পাত্রীর নাম মনি মুলেপাতি (২৪)। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০৫-এর ৩০ মে সকাল ১১টায়।

সাইকেলে চড়ে বিয়ে

ডন টিউটল এবং ক্যারল ডিবলে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠানে একটু ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা নিউইয়র্কের লেক জর্জের একটি স্বয়ংক্রিয় প্যাডেল সাইকেলে চড়ে বিয়ের কাজটি সমাধা করেছিলেন।

সার্ভিস স্টেশনে বিয়ে

ইংলন্ডের স্মিথ ও ক্রিস হ্যারেটের বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল এসেক্সের কাছে একটি হাইওয়ে সার্ভিস স্টেশনে।

জঙ্গলে বিয়ে

ইংলন্ডের কেমব্রিজের জনি কোলস আর মার্ক প্রিস্টনের মাথায় কী খেয়াল চেপেছিল কে জানে। তাঁরা গভীর অরণ্যে গিয়ে বিয়ে করেন এবং বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী আচার নিয়ম কানুনগুলো অনুসরণ করেন।

আবর্জনা স্তুপের মধ্যে বিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রের রকি গ্রাহাম ও ডেইভ হার্ট আবর্জনা ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার জন্য রেখে দেওয়া ক্যানের স্তুপের মধ্যে বিয়ে করেছিলেন।

কয়লাখনিতে বিয়ে

প্রায় ৪০০ ফুট গভীর কয়লা খনির ভেতর বিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন জন ডালটন এবং সারাহ ইয়ুরকুনাস।

উড়োজাহাজের ডানায় বেঁধে বিয়ে

জাস্টিন ও ক্যারলিন বানের বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছিল উড়ন্ত অবস্থায়। তারা চল্লিশের দশকে তৈরি দুটি বি আই উড়োজাহাজের ডানার সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখে বিয়ে করেছিলেন।

বরফের প্রাসাদে বিয়ে

১৭৪০ সালে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী জারিনা আদেশ করেছিলেন, দেশের কোনও লোক বিদেশিকে বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু এই নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন গ্যালিটজিন নামে এক ব্যক্তি। তিনি এক ইটালিয়ানকে বিয়ে করেন। এর ফলে সম্রাজ্ঞী ক্রুদ্ধ হয়ে

তাকে রাশিয়ার প্রচন্ড ঠান্ডা জায়গা নেভা নদীর তীরে তৈরি করা বরফের প্রাসাদে দেশের সবথেকে কুৎসিত এক মেয়ের সঙ্গে বাসর ও জীবন কাটাতে আদেশ দেন। আর হলও তাই। সকলের ধারণা ছিল, তারা বেশিদিন বাঁচবে না। তাই সৈন্যরা নিয়মিত খাবার নিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেত। ঠিক এক বছর পর যখন তাদের যমজ শিশু জন্মলাভ করে, তখন সম্রাজ্ঞী মারা যান। এই অবসরে গ্যালিটজিন মুক্তি পেয়ে পালিয়ে যান তাঁর ইটালিয়ান পত্নীর কাছে এবং সেখানে তাঁরা ঘর বসান।

জলে নিক্ষেপ করে বিয়ে

আফ্রিকার ইথিওপিয়াতে বর বধূকে কাঁধে নিয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে জলে ফেলে দেয়। আর বরের চেষ্টা থাকে জোর করে কনেকে জলে ফেলার, কারণ যত বেশি শব্দ হবে, বিয়েতে তত বেশি সুখ হবে বলে লোকেদের ধারণা।

বিয়েতে গরুর লেজ

রাজপুতানার বিকানীর-এ হিন্দুদের বিয়েতে কোনও বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে কনের হাত বেঁধে দেওয়া হয় একটি গরুর লেজের সঙ্গে। গরুটি 'হাম্বা' বললে তবেই শুরু হয় বিয়ের অনুষ্ঠান।

সূর্যের সাথে বিয়ে

আমাদের দেশে সুন্দ্রা গোত্রের লোকদের বারো বছরের কুমারী মেয়েদের বিয়ে হয় সূর্যের সঙ্গে। কনে বিয়ের সাজে গামলার জলে সূর্যের মুখ দেখে নেয়। ব্যস হয়ে গেল সূর্যের সঙ্গে বিয়ে। বাকি জীবনে ওই মেয়েটিকে সূর্যপত্নী হয়ে থাকতে হয়। কোনও পুরুষ বিয়ে করতে পারে না সূর্য দেবতার স্ত্রীকে।

কুলকুচো করে বিয়ে

আফ্রিকার রয়ান্ডাতে ওয়াটুসি গোষ্ঠীর বিয়েতে মুখে জল নিয়ে কুলকুচি না করলে বিয়ে হয় না। বিয়ের অনস্ঠানে সবার উপস্থিতিতে বর প্রথমে মুখে জল নিয়ে কুলকুচো করে কনের গায়ে সেই জল ছিটিয়ে দেয়। এই একই ভাবে কনে মুখে জল নিয়ে কুলকুচো করে বরের গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করে।

বিয়েতে কুকুর

কঙ্গোতে গুলেম্বা উপজাতির মধ্যে বিয়ের সময় কুকুরের প্রয়োজন হয়। বিয়েতে কনের মূল্য ধরা হয় ৮ টা তার ক্রুশ, ৩৫টা চিকেন এবং ৪টি কুকুর। কিন্তু এ জায়গায় কুকুর সংগ্রহ করা খুবই শক্ত ব্যাপার। তাই কুকুরও উপহার হিসাবে গণ্য করা হয়।

গাছের মধ্যে বিয়ে

আমাদের দেশে পন্ডিচেরীতে বৃষ্টির দেবতাকে খুশি করার জন্য গ্রামবাসীরা আনুষ্ঠানিক ভাবে দুটি গাছের মধ্যে বিয়ে দিয়েছিল ২০০৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। এউ.এন.আই. বার্তা সংস্থা এই খবর প্রকাশ করেছিল। এই বিয়েতে শত শত গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন এবং হিন্দু রীতি অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হয়। এই বিয়েতে নিম গাছকে বর এবং অশ্বত্থ গাছকে কনে সাজানো হয়েছিল।

পশুদের বিয়ের অফিস

রাশিয়ার জার পিটার দ্য গ্রেট তাঁর শাসনকালে তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি অদ্ভুত বিয়ের অফিস। সেখানে কোনও মানুষের বিয়ে দেওয়া হত না, বরং রাজ্যের যত গরু, ছাগল, কুকুর, শুকর ইত্যাদি প্রাণী ছিল তাদের স্ত্রী - পুরুষের জোড়া বেঁধে বেঁধে বিয়ে দেওয়া হত।

লাথি মেরে বিয়ে

এই লাথি সেই লাথি নয়। এ লাথি বন্ধনের। তাইওয়ানের এক গোষ্ঠীর বিয়ে হয় লাথি মেরে। বিয়ের সময় বরকে লাথি মারতে হয় কনেকে। বর কনের হাঁটুর নীচে কায়দা মতো লাথি মারলে তবে বিয়ে সম্পন্ন হয়।

বহু বিচিত্র ঘটনা, আচার প্রথা ছড়িয়ে আছে আমাদের আশেপাশে। পৃথিবীতে বৈচিত্রের শেষ নেই।

বিবাহ সূত্রে পঞ্চগাথা

পল্টু ভট্টাচার্য

পাকা দেখা

সাহাদার পাকা দেখার দিন হবু কনেপক্ষের তিন চারজন বাড়ির সামনে হাইড্রেনে একেবারে ঝপাং। পাড়ার লোকেরা বারোয়ারি পুকুরে তাদের চান করাল। তারা সাহাদাদের দেওয়া জামা কাপড় পরে বাড়ি ফিরে গেল। পাকা দেখা হলো না কিন্তু সাহাদার বিয়েটা পাকা হয়ে গেল।

বরানুগমন

ছোটমামার বিয়েতে নবদ্বীপ গেছি। আমরা বরযাত্রীরা সাইকেল রিক্সা চেপে যাচ্ছি আর সামনে যাচ্ছে ব্যান্ড। গান বাজছে ‘ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা....’, আমার প্রেসিডেন্সিতে পড়া ফুলদা ‘অল রাবিশ’ বলে ফিরে গেল। আর আমরাও ট্রেনে যাবার সময় টাকায় আঠাশটা করে সন্দেশ খেয়ে সারারাতই বাথরুম আর ঘর করলাম ছোট মামার বিয়ে দেখা মাথায় উঠল।

বিবাহলগ্ন

পঞ্চুদা অত্যন্ত ফাঁকিবাজ আর লোভী পুরোহিত। বন্ধু সোমনাথের বিয়েতে ভোররাতে বাসি বিয়েটা না দিয়ে পালাবার তালে ছিল। বিপদ বুঝে সোমনাথের শ্বশুর চেয়ারে বসা পঞ্চুদাকে দেখিয়ে বাড়ির লেড়ি কুত্তা ভোলাকে বলল ‘ভোলা ঠাকুরমশাইকে আত্তি যত্ন করিস’। সারারাত ভোলার চিৎকার আর তাড়ার চোটে পঞ্চুদার আর পালানো হল না।

অতিথি আপ্যায়ন

এক দাদার বৌভাতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহানায়ক উত্তমকুমার বাড়িতে হাজির। গোটা পরিবেশনকারীর দল এতোই ব্যস্ত হয়ে গেল যে পংক্তি ভোজন পড়ে রইল তারা ছুটল উত্তম দেখতে। বুড়ো বাপ জ্যাঠারা রাগে গজগজ করে বালতি হাঁড়ি ধরল। গোটা বাড়িটা যেন লন্ডভন্ড হয়ে গেল।

ফুলশয্যা

সমবয়স্ক নকুল মামা কাকিমার বোন অঞ্জু মাসিকে প্রেম করে বিয়ে করল। সেই প্রেমের পত্রবাহক ছিলাম আমি। ফুলশয্যার রাতে ঘরের ভিতর থেকে আর্তনাদ। মরে গেলুম, মরে গেলুম বাবারে ...., এ্যালার্জি এ্যালার্জি .... দরজা খুলে অঞ্জু মাসি বলল পল্টু আমার গলা থেকে জুঁই ফুলের মালাটা খুলে দে। তোর মামা জানে না যে আমার জুঁই ফুলে এ্যালার্জি। সোহাগী নকুল মামা তখন দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে।

কুল বিবাহের ইতিহাস

ডা. শুভেন্দু ভট্টাচার্য

পুঁথি অনুযায়ী বাঙালী বিবাহের সূত্রপাত ঘটে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে, তারপর ১৫০০ খ্রি. থেকে ১৮৫০ খ্রি. পর্যন্ত চলে কুল সৃষ্টির কাজ। সৃষ্টি হয় কুলজি, কুল-কারিক, কুল-বিধান ও নানাবিধ কুল পঞ্জিকা। এবং এই অনুসারে উৎপত্তি হয় কুল বিবাহের। তখনই সৃষ্টি হয় পণপ্রথার। কুল বিবাহ কতগুলি আধারের উপরে নির্ধারিত হতো। সেগুলি হ’ল — ১.কুল-কার্য্য, ২. কুল-কর্ম, ৩. কুল-ক্রিয়া, ৪. কুল-ধর্ম, ৫. ঢাকুরি। এই ধরনের বিবাহে, বিবাহ বাসরকে বলা হতো সমাজ সভা, যার এক জন পুরধা থাকতেন তাকে বলা হতো সমাজপতি। তিনিই এই বিবাহ পরিচালনা করতেন। এই কুল বিবাহ প্রথা চলে রাজা বল্লাল সেন-এর সময় পর্যন্ত। এরপর শুরু হয় মহারাজ আদিসুর-এর যুগ তখন উৎপত্তি ঘটে কুলিন প্রথার।

মহামায়ার মর্তে আগমন

শ্রীতমা মুখার্জী

আকাশে শরৎশশী দেখে রানীর কন্যার মুখ মনে পড়েছে। তাই গিরিরাজকে বললেন "মেয়েকে আনতে গেলে না?" গিরিরাজ বললেন "বুঝলে গিন্নি বাতের ব্যাথাটা কম থাকলে নিজেই যেতুম। কিন্তু বড় কষ্ট তাই লিঙ্গ পর্বত থেকে আমার মহামন্ত্রী গেছে উমাকে আনতে।"

রানী ঃ তা সে পৌঁছে গেছে তো।

গিরিরাজ ঃ পৌঁছে এস.এম.এস. করেছে আমায়।

রানী সঙ্গে আমাদের ছেলে মৈনাককে পাঠাতে পারতে তো

গিরিরাজ ঃ আহা বুঝছ না রাজনৈতিক দলগুলোর হাল ভাল নয়। রাজআসন নিয়ে টানাটানি একজন আমায় মানে তো আর একজন মানে না।

রানী ঃ তা মহামন্ত্রীকে ফোন করে দেখনা।

(নারদমুনির আগমন)

নারদ ঃ প্রণাম মহারাজ, প্রণাম মহারাণী। স্বর্গে এখন দারুণ উত্তপ্ত আবহাওয়া, মা বলে দিয়েছেন এবার তিনি মর্তে এলে প্লেনে করেই আসবেন। নচেৎ নয়। ওদিকে বাবা তাকে প্লেন ভাড়া দেবেন কি করে তিনি যে এ বিষয়ে বড়ই উদাসীন।

রানী ঃ ওগো আমি বলি কি চল না আমরা আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজটা করে নিই তাহলে আমার মেয়েটার ভিসা পাওয়ার অসুবিধা হবে না। আর সেরকম হলে তুমি না হয় তোমার প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকাটা দিলে টিকিট পেতেও অসুবিধা হবেনা।

গিরিরাজ ঃ খেপেছ এমনিই আমাদের Social Marriage-র দিনটাতে কি উপহার দেব তাই নিয়ে একমাস ধরে তুমি আমার মাথা খারাপ করে দাও তার সঙ্গে আবার একটা অ্যানিভার্সারি! শোন রাণী পৃথিবীতে দুটো বিপরীত ধর্মী শব্দ সব সময় পাশাপাশি বসে তা হল 'হ্যাপি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি'। কারণ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ক্যান নট বি হ্যাপি। ওতে বিয়ে বৌ দুটোই পুরনো হয়।

ওদিকে স্বর্গে কৈলাসে

নারদ ঃ প্রণাম মাতা

দুর্গা ঃ আরে নারদ বিউটি টিপস্ ট্রাই করছি দেখতে পাচ্ছ না? এখন স্কিনে প্রবলেম হলে দেখবে কে? তাছাড়া এরপর প্রাণায়াম করতে হবে, বিরক্ত কর না তো।

নারদ ঃ মা আপনি মর্ত্তে যাবেন না?

দুর্গা ঃ যাবনা, আমার সিদ্ধান্ত অটল।

নারদ ঃ কিন্তু মা মর্ত্তে প্যান্ডেলে বাঁশ পড়েছে, সব আশায় যে জল পড়ে যাবে।

নন্দী, ভৃঙ্গী ঃ ও মা দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্তের বিমান বন্দরে কথা বলেছেন তারা Social festival বলে তোমাদের টিকিটের ভাড়া কন্সিডার করেছেন এবার তবে যাও মা।

মা ঃ বেশ ভেবে দেখি তাহলে

খানিক আগে প্লেন ক্র্যাশ। মা সদলবলে এসে পড়লেন কাদাপাড়া ক্লাবের প্যান্ডেলে। তাঁর উদাসীন স্বামী আগে ভাগেই সেখানে উপস্থিত। দেবী লজ্জিত মুখে স্বামীর দিকে চাইতেই শিব বললেন, হে মহামায়া যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা মানে এই নয় যে অতীত কে ত্যাগ করা। যে যেমন তাকে তেমনই মানায়।

ঠিক হল আর প্লেনে নয় পুজোর শেষে মা পতীগৃহে পুনরাগমন করবেন গজে।

শিবদুর্গা বিবাহ কান্ড

আমাদের হিন্দু সমাজের কারবার এক আধজন নয় একেবারে তেত্রিশ কোটি দেবতা নিয়ে। তাঁদের মধ্যে শিব হলেন জগৎপালক ও মা দুর্গা হলেন জগন্মাতা। এঁদের বিবাহ বিভ্রাট ঘোর কলি যুগেও জনপ্রিয়।

মাতা পার্বতীর বিয়ের আগে তাঁর মা মেনকার আকাঙ্খা ছিল বাঘছাল পরা জামাইকে পশু হত্যার অপরাধে হাজতে দিন কাটাতে হয় কিনা। সেই ভয় কাটাতে হিমালয়রাজ মা মেনকাকে আশ্বস্ত করেন যে বিবাহের পর যদি মহাদেব সস্ত্রীক হাজত বাস করেন তবে তা সৌভাগ্যের কথা। কারণ আপাতত দুনিয়ার সবচেয়ে সুখের বাসস্থান হল সেন্ট্রাল জেল। সেখানে থাকা খাওয়া পোষাক ও নিরাপত্তা একদম বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

এরপর অবশেষে আসে শিব পার্বতীর বিবাহ স্কন্ধ। মা-মেনকা তার জামাতা বরণ করার পর শর্ত অনুযায়ী শিবের শ্যালিকারা স্বাধীন পুরুষ হিসাবে তাঁর শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে চান। কারণ বিবাহের পর তিনি চিরপরাধীন হতে চলেছেন। তখন শিব তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে বলেন।

''শোন তবে বলি সবে আমার মনের উইশ কি
সুরা গ্লাসের একটা ছটাক (লাইম ওয়াটার)
বাকি ভাগটা হুইসকি।''

এরপর আসে সেই মহামিলন লগ্ন, যখন হরপার্বতী বিবাহ ডোরে বাঁধা পড়বেন। কিন্তু জগন্মাতা বিবাহ পূর্বে শিবের কাছে কিছু চান, তিনি চান আগামী দিনে সমাজে বিবাহ যেন যৌতুকের অপর নাম না হয়, আর যেন ঘরে ঘরে গৃহবধু অত্যাচারিত না হয়, এরপর বিবাহ যেন হয় শুধু আত্মায় আত্মায় মিলন, পরিবারে পরিবারে সম্পর্কের বাঁধন। বিবাহ যেন হয় নতুন সম্পর্কের পবিত্র আচ্ছাদন। শিব বলেন — তুমি মহামায়া, ব্যাপারটা মর্ত্তের মানুষের ওপরই ছেড়ে দাও!

বাঁচতে গেলে হাসতে হবে

বিনয় সরকার

ভোরের আলো ফোটার সাথে
পাখীদের শুনি কত কলরব
মানুষগুলোর কথা ফোটে না
মন মরা যেন — কেমন নীরব।

কারোর মুখে নেইকো হাসি
গোমড়া মুখে চলছে সবাই
কারের দিকে কেউ দ্যাখে না
পিছন ফিরে চলছে সদাই।

সূর্যি মামা রোজ সকালে
হাসি মুখে বিলোন আলো
মানুষগুলো তাও বোঝে না
হাসতে সবাই ভুলে গেল?

রাতের বেলায় চাঁদের হাসি
মুছিয়ে দেয় যত কালো
আঁধার শেষে জানিয়ে দেয়
ফুটবে এবার প্রাণের আলো।

সুখ দুঃখে জীবন গড়া
দুঃখ ভুলে যাও এগিয়ে
প্রাণ খোলা যত হাসি নিয়ে
সবার মনে দাও ছড়িয়ে।

বাঁচার মত বাঁচতে গেলে
হাসতে হবে দরাজ মনে
হাস্যরবে মাতুক জীবন
হাসির জোয়ার আসুক প্রাণে

ক্ষনিকের এই জীবন যখন
থাকবে কেন দুঃখ নিয়ে
হেসেই জীবন কাটিয়ে দাও
সবার মন দাও রাঙ্গিয়ে।।

বিবাহ আসলে বন্ধুত্ব

শীলা পাল

একটি নারী ও পুরুষের একসাথে জীবন কাটানোর সামাজিক স্বীকৃতি বিবাহ। বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তারা সমাজে স্বামী স্ত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনের চলার পথে দু'জনে কিছু অঙ্গীকারের মাধ্যমে সামাজিক জীবন শুরু করে। স্বামী তার ভরণ পোষণ সুখ স্বাচ্ছন্দ জীবনের প্রয়োজনীয় দায় দায়িত্ব পালন করে। স্ত্রী সংসারের যাবতীয় দায় অন্তঃপুরের মধ্যে থেকে বহন করে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে এই সম্পর্কটি গাঢ় হয়।

পুরাকালে বিবাহের কোন চল ছিল না। নারী ছিল পুরুষের ভোগ্য বস্তুর মতো। বীর ভোগ্যা। জানা যায় ঋষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু বিবাহের নিয়ম প্রচলন করেন। একদিন ঋষি উদ্দালক যখন তাঁর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন, সেই সময় এক ঋষি উদ্দালকের স্ত্রীকে সম্ভোগের জন্য আহ্বান করেন। অতিথি ঋষির ইচ্ছা পূরণ করতে উদ্দালক পত্নী তাঁর সাথে অরণ্যে প্রবেশ করেন। পুরো ঘটনায় উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু স্তম্ভিত হয়ে যায়। পিতাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে এটাই প্রথা। পিতাকে অধোমুখে একথা বলতে শুনে শ্বেতকেতু এই ঘৃণ্য নিয়মের প্রতিবাদ জানান। সমাজ থেকে এ প্রথা উৎখাত করতে তিনি যে ব্যবস্থা করেলন তাই বিবাহ। বিবাহে আবদ্ধ কোনো স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষ কামনা করতে পারবেন না। একমাত্র স্বামীই এই অধিকার ভোগ করবেন। সেই নিয়মই আজ চলে আসছে বিবাহ রূপে।

সপ্তপদী

পরবর্তীকালে বিবাহের রকমফের দেখা গেল। অনেক রকমের বিবাহ প্রচলিত হল। ব্রহ্ম বিবাহ, দৈব বিবাহ, আর্ষ বিবাহ, প্রজাপত্য বিবাহ — এই চার প্রকারের বিবাহকে প্রশস্ত বিবাহ বলা হয়। কারণ এই বিবাহ রীতিগুলিতে একটি নারী এবং পুরুষ যখন বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে কতকগুলি আচরণের অঙ্গিকার করেন। এই অঙ্গিকার করা হয় অগ্নিকে সাক্ষী রেখে। চারটি প্রশস্ত বিবাহ রীতি ছাড়াও আরও চারটি বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল, যেগুলিতে বৈদিক রীতি মানা বা মন্ত্রোচ্চারণ করা হত না। এগুলি হল গান্ধর্ব বিবাহ, আসুর বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ এবং পিশাচ বিবাহ। গান্ধর্ব বিবাহ, স্বয়ম্বর সভার মতো বিবাহ প্রথাগুলো থেকে বোঝা যায়, নারী ইচ্ছামতো পুরুষ সঙ্গী নির্বাচন করতে পারতেন। তাই, বিবাহে শুধু পুরুষের পছন্দ বা ইচ্ছা প্রধান এমন নয়।

হিন্দু বিবাহ রীতিতে প্রধান বিষয় তিনটি — কন্যাদান, পাণিগ্রহন, সপ্তপদী। কন্যার পিতা বা পিতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি কন্যার হাত পাত্রের হাতে তুলে দেন। পাত্র কন্যার পাণি অর্থাৎ হাত গ্রহণ করে। এরপর দু'জনে একসাথে পবিত্র অগ্নিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে করতে একে অপরের জন্য কিছু শপথ নেয়। একে সাতপাক বা সাত ফেরেও বলে। সংস্কৃতে একে সপ্তপদী বলে। বৈদিক হিন্দু বিবাহ রীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি। সপ্তপদী শুরুর আগে পুরোহিত ঘোষণা করেন, 'জগতের পুরুষ ও নারী সপ্তপদীর মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবনের সুখকে উন্নীত করে, নিজেদের জয় সূচিত করে।'

এরপর পুরুষ ও স্ত্রী একে একে সাতবার চলে। প্রথম পদক্ষেপে পুরুষ বলে — তুমি আমার অতিথি, বন্ধু, পিতামাতা, সন্তানদের জন্য খাবার তৈরী করবে, বিষ্ণু রূপে আমি তোমার সাথে খাদ্যের জন্য প্রথম পা ফেললাম। স্ত্রী বলে — তুমি তোমার শ্রম দিয়ে যে খাবার জোগাড় করবে আমি তার সুষ্ঠ ব্যবহার করব, তোমার ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা করে পরিবার পরিজনদের মুখে খাদ্য তুলে দেব।

দ্বিতীয় পদক্ষেপে পুরুষ বলে — তুমি তোমার শুদ্ধ আচরণ এবং ভাবনা দিয়ে আমার ঘরকে সুখের করে তুলবে, বিষ্ণু রূপে আমি তোমার সাথে শরীরের শক্তি ও চরিত্রের জন্য দ্বিতীয় পা ফেললাম। স্ত্রী বলে — আমি আমার সাধ্যমত ঘর গৃহস্থালী রক্ষা করব। দুজনে মিলে একটা সুখের সংসার গড়ে তুলবো।

তৃতীয় পদক্ষেপে পুরুষ বলে — আমি সৎ উপায়ে জীবনধারনের জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখবো। তুমি আমার অর্জিত সম্পদ রক্ষা করবে। বিষ্ণু রূপে আমি তোমার সাথে সম্পদের সমৃদ্ধির জন্য তৃতীয় পা ফেললাম। স্ত্রী বলে — আমি তোমার আয় ব্যয়ের হিসাব রাখবো, তোমার সম্পদ পরিবারের প্রয়োজনে লাগে তা দেখবো।

চতুর্থ পদক্ষেপে পুরুষ বলে — সংসারের ব্যাপারে এবং তোমার পছন্দের ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তের ওপর আমার আস্থা থাকবে। বিষ্ণু রূপে আমি তোমার সাথে সংসারে তোমার অংশগ্রহণের জন্য তৃতীয় পা ফেললাম। স্ত্রী বলে — আমি কথা দিলাম আমাদের ঘরকে সেরা ও সুখের ঘর করে তোলার সাধ্যমেতো চেষ্টা করবো।

পঞ্চম পদক্ষেপে পুরুষ বলে — আমার গরু, চাষের জমি এবং রোজগারের বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। বিষ্ণু রূপে আমি তোমার সাথে খামার গবাদি পশুর বৃদ্ধি কামনায় পঞ্চম পা ফেললাম। স্ত্রী বলে — আমি তোমার খামার ও পশুদের দেখাশোনা করবো, এদের থেকে পাওয়া দুধ, ঘি, দই থেকে উপার্জন ও পরিবারের সন্তুষ্টির বিষয়টি দেখবো।

ষষ্ঠ পদক্ষেপে পুরুষ বলে — আমি তোমাকে এবং শুধু তোমাকে আমার ভালবাসা রূপে পেতে চাই। তোমার সাহায্যে সন্তান চাই, পরিবারকে বাড়াতে চাই। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। বিষ্ণু রূপে আমি তোমার সাথে জীবনের প্রতিটি রূপকে উপভোগের জন্য ষষ্ঠ পা ফেললাম। স্ত্রী বলে — আমি তোমার থেকে নিজেকে অভিন্ন ভাববো না। আমি তোমার সব সুখের কারণ হব। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে তোমাকে পূর্ণতা দিতে চেষ্টা করবো।

সপ্তম পদক্ষেপে পুরুষ বলে — আমার বন্ধু, আমাদের এই সপ্তম পদক্ষেপ একসাথে নিতে অনুমতি দাও যাতে আমরা সাত পা একসাথে চলা বন্ধু হয়ে যাই, তুমি আমার স্ত্রী হয়ে যাও। স্ত্রী বলে — হ্যাঁ, আজ, আমি তোমায় লাভ করলাম, আমি কথা দিলাম তোমার সাথে বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা থাকার। আমরা যেসব শপথগুলো নিলাম সেগুলো ভুলবো না। তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসা দেবো।

এই সপ্তম পদক্ষেপের পর তারা স্বামী স্ত্রী রূপে পরিচিত হয়। এই মন্ত্রে যা যা বলা হল তা নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সার কথা। সংসার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য চাই স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে অগাধ বিশ্বাস, অবাধ বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্বেরই জয়গান গেয়েছে বৈদিক বিবাহ মন্ত্র। আজও সফল বিবাহ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এই নির্দেশগুলি মানা ছাড়া উপায় নেই।

বিয়ে মানে

সুখেন্দু বিকাশ পাল

বিয়ে মানে বর কনে নব সাজে সাজা
বিয়ে মানে বর হ'ল সেদিনের রাজা।
বিয়ে মানে কনে বাড়ি আলো ঝলকানি
বিয়ে মানে কনে হ'ল সেদিনের রানী।
বিয়ে মানে মহাভোজ, মহা ধূমধাম
বিয়ে মানে টেনশন, মাথা-ঝরা ঘাম।
বিয়ে মানে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ
বিয়ে মানে বর-কনে গাঁটছড়া ধারণ।
বিয়ে মানে ছাদনাতলা, যাচ্ছে লোকে ভুলে
বিয়ে মানে উলুধ্বনি, কোথায় গেছে চলে।
বিয়ে মানে সানাইয়েতে করুণ সুর সাধা
বিয়ে মানে সবাই জানে সাত পাকে বাঁধা।
বিয়ে মানে বরযাত্রী, বরের চেয়ে দামী
বিয়ে মানে বরকর্তা সবার চেয়ে নামী।
বিয়ে মানে গান বাজনা, বাসর জাগা রাত,
বিয়ে মানে সবাই বলে বরের কিস্তিমাত।

ভূতাদিদির বিয়েতে

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

লজ্জাবতী ভূতা দিদির
বিয়ের আয়োজন
তাইতো ভূতা দিদির আজ
খুশী খুশী মন।
ভূতা দিদি বসে বসে
ভাবছ তুমি কী?
শ্বশুর বাড়ি যাবে বলে
কেঁদোনা যেন ছি !
আর কেঁদো না, আর কেঁদো না,
লক্ষ্মী দিদি শোনো,
শ্বশুর বাড়ি গিয়ে মোদের,
ভুলো নাকো যেন।

এই বিয়ের পদ্যটি হ্যাণ্ডবিল আকারে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিতরণ করা হয়েছিল ৩১ জুলাই ১৯৯০ তে।

তু ষা র তী র্থ অ ম র না থ

সুজয় বাগচী

রঞ্জন হঠাৎ করেই বলেছিল, 'অমরনাথ যাচ্ছি! যাবি?' তখন দেখছি বলে কাটিয়ে ছিলাম, কারণ আগে শুনেছিলাম যেতে গেলে অনেক রকমের 'টেস্ট' করাতে হয়, তাই 'মেডিকেল টেস্ট'-এর ভয়েই পিছিয়ে গেলাম। না যাওয়ার কারণ জানতে পেরে রঞ্জনই সব ব্যবস্থা করে দিল, উলুবেড়িয়া হসপিটাল থেকে আমার 'মেডিকেল রিপোর্ট' পেয়ে গেলাম। আমায় নিয়ে সাতজনের দল। রঞ্জন, আমি, চিত্রাদি, কবিতাদি, ছোটুদা, টিঙ্কুদা আর কাজলদি। যখন যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি তখন মাঝেমধ্যেই খারাপ খবর আসতে লাগল। কখনও মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান তো কখনও উগ্রপন্থী হামলা। ঘরে বাইরে অনেক কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে শেষ পর্যন্ত জম্মু স্টেশনে যখন পৌঁছালাম তখন বুঝলাম যে সত্যি সত্যি ভূ-স্বর্গে আসতে পারলাম। স্টেশন থেকে গাড়ি করে শুরু হল অমরনাথ যাত্রার প্রথম ধাপ। গন্তব্য পাটনিটপ, ১১২ কিলোমিটার রাস্তা। কিছুটা যেতে শুনলাম ধস নেমেছে, রাস্তায় প্রচুর গাড়ির ভিড়। শেষ পর্যন্ত পাটনিটপে পৌঁছালাম রাত সাড়ে দশটায়। সারাদিনের ধকলে ক্লান্ত, কোনক্রমে খেয়ে শুয়ে পরলাম। ভোর থেকে শুরু হল বৃষ্টি। একটু কমতে আমরা রওনা দিলাম শ্রীনগর।

পাহাড়ি পথের হালকা উতরাই ধরে পৌঁছালাম বাটোট। জায়গাটা ১৫৬০ মিটার উঁচুতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত বাটোট। গাড়ি ছুটে চলেছে সেই সৌন্দর্যে চোখ ভরিয়ে। দূরে বাগলিহার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। খরস্রোতা চন্দ্রভাগার ওপর বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীর বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। গাড়ি থামল রামবনে। এখানে সবাই খেয়ে নিলাম। রুটি, রাজমা, মটর-পনীর আর ডাল। আবার চলতে শুরু করলাম, রামবন থেকে রামসুগুণ্ড, বানিহাল গ্রাম পেরিয়ে চড়াই পথে শেষে বানিহাল টানেলে ঢুকলাম। টানেলটা ৭২৫০ ফুট উচ্চতায় আর প্রায় আড়াই কিলোমিটার লম্বা। এটা ১৯৫৪ সালে বানানো শুরু হয়েছিল, কাজ শেষ হয় ১৯৬০-এ। টানেল পেরিয়ে এসে পড়লাম কাশ্মীর উপত্যকায়। পাহাড়ের ওপর এমন সমতল অঞ্চল থাকতে পারে না দেখলে বিশ্বাসই হত না। চাষের জমি, নদী — ঠিক যেন বাংলার কোনো গ্রাম দেখছি। মুগ্ধতার আবেশ নিয়ে এসে থামলাম কাজিগুণ্ডায়। এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে আবার চলা। ২২ কিলোমিটার দূরে খানাবল। সেখানে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। সোজা রাস্তাটা যাচ্ছে শ্রীনগর আর ডানদিকের রাস্তা ধরে অনন্তনাগ, মার্তণ্ড হয়ে ৪৫ কিলোমিটার দূরে পহেলগাঁও। আমরা চললাম সোজা রাস্তায়।

খানাবল থেকে বীজবেহরা হয়ে অবন্তিপুর ২২ কিলোমিটার রাস্তা। যাওয়ার পথে দু'ধারে চোখে পড়ল ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর কারখানা আর দোকান। উইলো কাঠ থেকে এই ব্যাট তৈরী হয়। আরো দেখলাম রাজা অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে তৈরী প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এইসব দেখতে দেখতে বিকাল ৪টার সময় আমরা পৌঁছালাম শ্রীনগর। মমতাচকে বাদরিয়া রিসর্টে উঠলাম। হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে পড়লাম ডাল লেকের উদ্দেশ্যে।

শ্রীনগর শহরের হৃদপিণ্ড এই ডাল লেক। সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় এমন এক বিশাল প্রাকৃতিক হ্রদ সত্যিই বিস্ময় জাগায়। আমরা লেকে ঘোরার জন্য দুটো শিকারা ভাড়া করলাম। দু'ঘন্টা ঘুরলাম লেকের জলে। জলের ওপরই বাজার, আমাদের ডাঙার বাজারে যা পাওয়া যায় জলের বাজারেও তার কোনো অভাব নেই। ভোরবেলা সবজির বাজার বসে। নেহেরু পার্ক, চার চিনার, ভাসমান জনবসতি, চলমান জীবনযাত্রা দেখে মুগ্ধ হলাম। এবার রিসর্টে ফিরতে হবে। পরদিন অমরনাথ যাত্রা। মনে একটু ভয় জাগছে, ঠিকভাবে পৌঁছানো নিয়ে নানা সংশয় জাগছে। নানা লোকের কাছ থেকে নানা রকম কথা শুনেছি, তাই ভাবছি যদি কিছু হয়ে যায়। যাই হোক রিসর্টে ফিরে দেখি রাতের খাবার ভাত, আলুপোস্ত, মাছ, চাটনি, পাঁপড়। একেবারে বাড়ির মত খাবার খেয়ে মনে জোর ফিরে পেলাম। রাতেই ব্যাগ গুছিয়ে রেখে রঞ্জন, আমি আর ছোটুদা গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়ালই করিনি।

ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে সকলকে ডেকে তুললাম। গরম জলে স্নান সেরে চললাম নীলঘাট। সেখান থেকে হেলিকপ্টার। যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির ধ্বংসচিহ্ন চোখে পড়ল। সোনমার্গ পেরিয়ে নীলঘাটে পৌঁছালাম। সেখানে একটা 'আর্মি ক্যাম্প'। আমাদের উড়ান ১০টায়। পাহাড়ি পথে হাঁটার জন্য আমি বাড়ি থেকে একটা লাঠি নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা নিয়ে হেলিকপ্টারে উঠতে দিল না, অগত্যা ক্যাম্পে রেখে যেতে হল। যান্ত্রিক গোলযোগে সাড়ে বারোটার সময় রওনা হতে পারলাম। সকলে একসাথে যাওয়া গেল না। প্রথমে ছোটুদা একা, তারপর রঞ্জন, আমি আর কাজলদি, পরেরটায় বাকিরা। প্রথমবার হেলিকপ্টারে উঠলাম, কিন্তু মন প্রাণ ভরে গেছে। কি যে দেখলাম ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে উড়ে গিয়ে নামলাম পঞ্চতরণীতে। সব দেখে আমার পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। এত সুন্দর জায়গা যে আমার দেশে রয়েছে ভেবেও আনন্দ হচ্ছে। প্রাণখুলে ছবি তুলছি। আর সকলের ছবি

উঠলেও আমি বাদ, আমার ছবি নেই, আমি সবার ছবি তুলছি।

অমরাবতী নদীর তীরে ভৈরব পাহাড়ের নিচে পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশে মেশা পঞ্চতরণী। এখান থেকে মূল গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা। সকলের জন্য ঘোড়া ঠিক করা হ'ল। এর আগে একবার কুফরি ঘুরতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই ভয় যে একটু করছে না তা নয়। আমার সহিস করিম চাচা, আমায় সাহস দিয়ে বলল, 'কুছু হবে না।' ঘোড়া ঠং ঠং করে ঘন্টা বাজিয়ে এগিয়ে চলল। একতলা থেকে তিনতলা, এমন চড়াই উতরাই পেরিয়ে ঘোড়া যাচ্ছে। ছবি তোলা বন্ধ করে দু'হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে বসে আছি। ভয়ে মাঝে মধ্যে চিৎকারও করে ফেলছি। করিম চাচা আমাকে তার সংসারের গল্প, তার মেহের বিবি, ছেলে সেলিমের কথা বলে আমার ভয় কাটাবার চেষ্টা করছে। শুধু কান দিয়ে শুনছি আর চোখ দিয়ে দেখছি। আমার ছবি তোলা বন্ধ দেখে টিঙ্কুদা চেঁচিয়ে বলল, 'আরে ক্যামেরা খোল! আর কি আসতে পারবে!' করিমচাচাও সাহস দিল, 'কুছু হবে না, ভগবান ভোলে তেরা ভালই করবে।' চমকে গেলাম চাচার কথায়। মুসলমানের মুখে ভগবান, ভোলেবাবার নাম। সত্যি বাবার কি মহিমা, আল্লা ভগবান এক করে দিয়েছে। সর্বধর্মের একাত্মতা এদিন চাক্ষুষ করলাম। ক্যামেরা খুলে ছবি তুলতে থাকলাম। এভাবে চার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ক্যাম্পে এলাম।

ক্যাম্প থেকে দু কিলোমিটার হাঁটাপথ, তারপর ৪৫০ সিঁড়ি পেরিয়ে তুষারলিঙ্গের দর্শন। পুজোর সামগ্রী নিয়ে ক্যাম্পে ব্যাগপত্তর জমা দিলাম। মেয়েদের ডুলিতে তুলে দিয়ে আমরা ছেলেরা হাঁটছি। বেশী জোরে হাঁটা যাচ্ছে না, ধীরে ধীরে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে। রঞ্জনের শ্বাসকষ্ট শুরু হল। 'আর্মি ক্যাম্প' থেকে অক্সিজেন নিতে হল। আবার চলা শুরু করলাম। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে গুহামুখে পৌঁছলাম। ৪০ফুট চওড়া গুহা। গুহার গা চুঁইয়ে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে জল পড়ে ১৮ ফুট লম্বা তুষারলিঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে আছে মাতা পার্ব্বতী এবং গণেশ। শোনা যায় এক মুসলিম মেষপালক, তার হারানো মেষশাবককে খুঁজতে এসে এই গুহা আর তুষারলিঙ্গের খোঁজ পায়। পুরাণে আছে, মহাদেব এখানে পার্ব্বতীকে গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করেন। শুক-সারী সেটি আড়াল থেকে শুনে ফেলে। তাই তারাও এখানে বন্দি হয়ে পড়ে। পুরাণের শুক-সারী আজকের পায়রা। দেখলাম ওই দুর্গম অঞ্চলেও পায়রা রয়েছে। রূপার বেলপাতা, গাঁজা, সিদ্ধি, পৈতে — সব গুছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম পুজো দেবার জন্য। সে সব দিয়ে বাবাকে পুজো দিলাম। পুরোহিত মশাই আমাকে একটা ছোট পয়সা দিয়ে সর্বদা সঙ্গে রাখতে বললেন। আমি ভক্তিভরে অমরনাথের পবিত্র চিহ্ন গ্রহণ করলাম।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। সকাল থেকে কিছু খাওয়ার কথা মনে হয়নি, কিন্ত এবার বেশ খিদে পেয়েছে। আমি, রঞ্জন আর টিঙ্কুদা রুটি, ডাল, সবজি, মিষ্টি খেলাম। বাকিরা কিছু খেল না। আবার ঘোড়ায় চেপে ফেরা। তবে ফেরার পথের কষ্টটা বেশী। প্রচণ্ড চড়াই উতরাই রাস্তা, পাশে খাদ, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের সাতটা ঘোড়া। হঠাৎ শুনলাম 'বাঁচাও! বাঁচাও!' চিৎকার। পিছন ফিরে দেখি, কাজলদির ঘোড়াটা পাহাড়ি পথ বেয়ে সহিস ছাড়াই একা একা নেমে আসছে। ঘোড়ার পিঠে বসে কাজলদি ভয়ে চিৎকার করছে। করিম চাচা আমার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল কাজলদির ঘোড়াটাকে সামলাতে। তার আগেই আর্মির এক জওয়ান ঘোড়াটাকে ধরে ফেলে, কাজলদিকে সামলে নেয়। আমার ঘোড়া ছেড়ে যাওয়ার জন্য চাচার ওপর রেগে গিয়েছিলাম, কিন্ত চাচা শুধু হাসল। এবার শান্তিতে যাওয়া যাবে ভাবছি, এমন সময় রাস্তার বাঁক ঘুরতেই চিত্রাদি ঘোড়ার পিঠ থেকে বরফের ওপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আবার করিম চাচা ছুটে গিয়ে চিত্রাদিকে ধরল। আমি চিৎকার করে উঠতেই অনেকে ছুটে এল। আমার থে কে একটু জল দিলাম, চিত্রাদি অনেকটা সুস্থ হল। আবার চলা। ঘোড়া দাঁড়াচ্ছে না, হেঁটেই চলেছে। কেউ পাশে নেই, শুধু আমি, চাচা আর চিত্রাদি। যাওয়ার সময়ই চাচা আমাকে পা জোড়া করে রাখতে বলেছিল। সেই কথা আবার বলল, পায়ের ব্যালেন্স ঠিক রাখতে, ঘোড়া পড়বে না। ও 'মাইজি'কে দেখছে। চাচার কথামত দু'পা দিয়ে ঘোড়াটাকে চেপে ধরে বসে রইলাম, ঘোড়া ঘন্টা বাজিয়ে চলতে থাকল।

মুখে দু এক ফোঁটা জল এসে পড়ল। ওপরে চেয়ে দেখি মেঘ জমেছে, বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টিতে যাওয়া যাবে না, ওদিকে ঠিক সময়ের মধ্যে না পৌঁছালে হেলিকপ্টার পাওয়া যাবে না। প্রাণ পণে ঠাকুরকে ডাকতে থাকলাম, বৃষ্টি যেন না হয়, ঠিক সময়ে যেন হেলিকপ্টার পেয়ে যাই। ঠাকুর বোধ হয় প্রার্থনা শুনলো। ওই এক দু ফোঁটা হয়েই বৃষ্টি থেমে গেল। আমরাও ঠিক সময়ে হেলিপ্যাডে পৌঁছালাম। তবে যত সহজে বললাম তত সহজে পৌঁছানো যায়নি। চিত্রাদি আরো একবার পড়ে যেতে যেতে বাঁচল। করিম চাচা আমাকে ছেড়ে 'মাইজি' কে সামলে নিয়ে এল। টানা দু'ঘন্টা একরকম যমে মানুষে টানাটানি করে আমরা পঞ্চতরণী পৌঁছালাম। ক্যামেরার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। হেলিপ্যাডে পৌঁছে সবার ছবি তুললাম। একে একে সবাইকে হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে শেষ বারেরটায় আমি আর রঞ্জন উঠলাম। ঘড়িতে সন্ধ্যে সাতটা, কিন্ত চারিদিক রোদ ঝলমল করছে। শেষ উড়ানে যখন নীলঘাট পৌঁছালাম, তখন যুদ্ধ জয়ের অনুভূতি হল। এভারেস্ট জয়ের থেকে এটা কিছু কম মনে হল না আমার। যাত্রা শুরু করেছিলাম অনিশ্চয়তার মধ্যে কিন্ত শেষ করলাম পরম তৃপ্তিতে। পথে পেলাম অজস্র স্মৃতি, সঞ্চয় করলাম অ ফুরান অভিজ্ঞতা। যাত্রাপথ মনের মণিকোঠায় ভয়ঙ্কর সুন্দর স্মৃতি হয়ে জেগে থাকবে। — সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। শিবই সত্য, শিবই সুন্দর।

ছোটদের লেখা
এবং ছোটদের জন্য লেখা নিয়ে
জেলার খবর সমীক্ষা'র
নবম শারদ সংখ্যার বিশেষ পর্ব

ছোটদের পাতা

পুজোর পাঁচালী

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

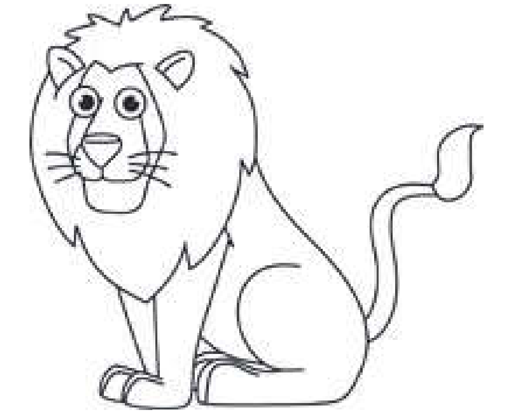

এসেছেন দুর্গাদেবী
ছোটদের ফুর্তি হেভী,
সকলেই আনন্দেতে
বিন্দাস, উঠল মেতে।
জয় মা দশভুজো
সার্থক তোমার পুজো
কুড়াকুড়, তাক-কুড়াকুড়
বাতাসে সুর সুমধুর।

আর আছেন সরস্বতী
শিক্ষায় সরস অতি,
আমাদের কাণ্ড দেখে
ছুটলেন সফর রেখে।
শিক্ষায় খুনোখুনি
সকলেই দারুণ গুণী,
কাঁদে দেবী শিল্পকলার
বেশি কিছু নেইকো বলার।

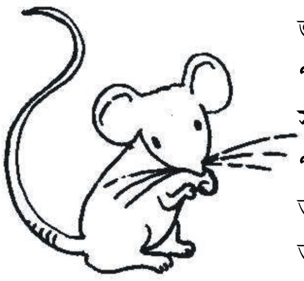

পাশে কে? সিদ্ধিদাতা
জগতের পরিত্রাতা,
গজানন - গণপতি
সকলের প্রিয় অতি।
গনুদার বিশাল ভুঁড়ি
তাতে দেয় কে সুড়সুড়ি?
তাতে কে মাখায় সিঁদুর?
কে আবার,বাহন ইঁদুর।

তাঁর দিদি লক্ষ্মীদেবী
তাঁকে নিয়ে ঝক্কি হেভী,
কেন তাঁর ঝাঁপ্পি খালি
ঝুলিতে তাপ্পি তালি।
প্রতিবারই ঘাটতি বাজেট
সকলের তাই মাথা হেঁট,
চিন্তায় পেঁচাপেঁচি
করে রোজ চেঁচামেচি।

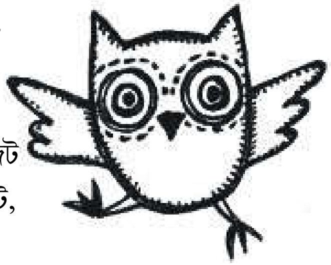

আর আছেন কার্তিকেয়
রূপে - গুণে সবার শ্রেয়,
তিনি দেবসেনাপতি
শরীরে শক্তি অতি।
ময়ূরের পিঠে চড়ে
সারাদিন ঘোরেন জোরে,
জয় দাদা শক্তিপাণি
তোমাকেই 'গুরু' মানি।

রাগেতে কাঁপছে অসুর
বলে,মাপ কোরো মা কসুর,
এ - খেলা থামবে কবে?
আমাকেই মরতে হবে?
আর কতো খাবো খোঁচা?
এখুনি ছুটবো চোঁচা,
সেকথা ভেবে নিয়ে
বাড়িয়েই দাও মা ' ডি.এ.'।

সায়নী চ্যাটার্জী (প্রিপেটারী / হেরিটেজ একাডেমী)

থি মে র পু জো

জহর চট্টোপাধ্যায়

পাড়ায় পাড়ায় থিমের পুজো, ঠাকুর রকমারি,
শুনছি এবার ঠাকুর হবে ডাল ভাত তরকারির।
মাঠ জুড়ে তাই জ্বলছে উনুন, ফুটছে হাঁড়ির ভাত,
ঠাকুর গড়তে রাঁধছে লোকে, সকাল থেকে রাত।
ব্যাপার দেখে কাঙালী এক, ফুটপাতে যার বাসা,
ভাবল, বুঝি ভোজ লেগেছে, খাবার খাবে খাসা।
ছুটল দেখে, আনতে ডেকে, থাকে যারা ফুটপাতে,
খবর শুনে যে যেখানে চলল থালা হাতে।
মিছিল দেখে, পুজোর লোকে, এ ওর পানে চায়,
কেমন করে রুখবে তাদের কি হবে উপায়?
একটা তালা ঝুলিয়ে দিল, মাঠে ঢোকার গেটে,
খাবার নিয়ে খেলছে ওরা, থাক তোরা খালি পেটে।
কদিন পরে ফুটপাতটা আলোয় দেবে মুড়ে,
বিনি পয়সায় আলো পাবি তোদের ঘরে ঘরে,
রঙিন আলো চাস যদি তো খাওয়ার কথা ভুলে,
যেখান থেকে এসেছিলি সেখানে যা চলে।
সেরা থিমের পুরস্কারটা এবার আছে বাঁধা,
অন্ন দিয়ে অন্নপূর্ণা —পুরনো সেই ধাঁধা!

লাভেলা ভৌমিক (কে. জি. / অগ্রসেন বালিকা বিদ্যালয়)

দেবাদৃতা ঘোষাল (চতুর্থ শ্রেণী / অগ্রসেন বালিকা বিদ্যালয়)

তরুণিমা ভৌমিক (চতুর্থ শ্রেণী / অগ্রসেন বালিকা বিদ্যালয়)

পুজোর হাসি কান্না

আশিষ গুপ্তা (ষষ্ঠ শ্রেণী)

রোদভরা ফাটা মেঘের আকাশখানা দেখি, —
শরৎ এল, আসবে পুজো দিনের হিসেব রাখি।
বছর ধরে দুঃখ দিয়ে এল মা এদেশে —
চারটি দিন মহোৎসবে,আনন্দেতে ভাসে।
শুধু কি মা দুর্গা আসে, গণেশ-কার্তিক-লক্ষ্মী,
সরস্বতীর কাছে আমার বিদ্যা রয় সাক্ষী।
নবমীর রাতে আমার মনটা কেমন করে!
দশমীতে সকাল থেকে আঁখির অশ্রু ঝরে।
বিসর্জনে মায়ের সঙ্গে আনন্দ যায় চলে
আসছে বছর আসবে সে মা দুর্গা ফিরে এলে।

খুশীর শরৎ

রূপম দাস (পঞ্চম শ্রেণী)

শরৎ মানে সবার মনে আনন্দ উচ্ছ্বাস
শরৎ মানে ঘাসের বনে দুলতে থাকা কাশ।
শরৎ মানে দুর্গাপুজো চলবে অনেক দিন
ঢাকের আওয়াজ আসবে কানে তাক-ধিনাধিন-ধিন।
দুর্গাঠাকুর দশভুজা, দশ হাতে দশ অস্ত্র,
তাঁরই পুজায় আমরা পড়ি নতুন নতুন বস্ত্র।
দশটি হাতে দশ প্রহরণ, আর আছে এক সাপ,
এক ছোবলেই অসুর পালায় দিয়ে লম্বা লাফ।
চারটি দিনের খুশীর পরে আসে বিদায় বেলা
মূর্তি ভাসান দেওয়ার আগে চলে সিঁদুর খেলা।
দুর্গাপুজো হবে আবার একটা বছর পরে —
দুর্গা মাকে আনবে সবাই ট্রাক-লড়িতে চড়ে।
শরৎ হল ঋতুর রানী, যেই হবে তার অন্ত
খুশীর শরৎ গেলেই শুরু হবে ঋতু হেমন্ত।

আজও চুপচাপ

মৌমিত্র ভৌমিক

মেঠো পথের ধার দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে সান্বি নদী
কিছু যন্ত্রণা, কিছু ভালোবাসা, নিয়ে সে
আজও ....

প্রকৃতিকে সে তার জল দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে
মাঠগুলোকে সে করেছে শস্য শ্যামলা।

যেন এটাতেই তার আনন্দ।
দুঃখটাকে সে পাশে সরিয়ে রেখেছে।
আসলে তার দুঃখটা বোঝার মতো কেউ নেই।

মাঝি ঘেটো নৌকা নিয়ে পাল তুলে নিশ্চিন্তে বয়ে যাচ্ছে
শূণ্যি মাসি, ছোটা ডিঙিটাতে আজও মাছ ধরে বেড়ায়
বিপাশা দিদি, চুন্নিবালা, দিপা বৌপানী সান্বির
বুকে কি জোরেই আছাড় মারে
পঞ্চ বুড়ো, নিধুকাকা
এরাও বাদ দেয় না সান্বিকে অত্যাচার করতে
সান্বি ধীর স্থির ভাবে আজও সেই বয়ে চলেছে

মুখে তার ভাষা নেই
সে যেন সর্বং সহা
সে হয়তো প্রতিবাদ করতে চাইছে,
কিন্তু তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই
আসলে তাকে সবাই ব্যবহার করছে
এই অত্যাচারিত সান্বি
কি কখনও পারবে নিজের জন্য রুখে দাঁড়াতে

সে কি তার পাশে পাবে কাউকে?
তাকে অত্যাচারের ইতি কি টানা হবে?
সমাজ কিন্তু চুপচাপ।।

ডানা ভাঙা পাখি

দেবার্ঘ্য রায় (ষষ্ঠ শ্রেণী)

আকাশে আজ সারাদিন মেঘের ঘনঘটা। তারই ফাঁক দিয়ে ফুটে উঠেছে সূর্যের আলো কখনও বা পড়ছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। বর্ষার জল তখনও যায়নি। জমে আছে মাঠে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে ঝপাং ঝপাং করে মাঠে খেলছে ছেলের দল। বাড়ির বাগানের রাস্তা শিউলি ফুলে ভর্তি। কাছেপিঠেই কাঠামোতে মাটি চাপিয়েছে কুমোর। ঘরেতে আজ মন বসে না। তাই চারদেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে পরলাম। সাথে ছিল কাগজ, কলম। বাগানের এক জায়গায় বসে লিখতে শুরু করলাম একটা কবিতা। ঘর থেকেই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। প্রথমে কিছুটা আওড়ে নিলাম। তারপর লিখতে লাগলাম —

কাজ ফেলে আজ বাগানেতে
বসে আছি আমি একেলায়,
মন নেই আজ পড়ায় স্নানে,
মন নেই আজ খেলায়।

ঘনঘটা আজ সারা আকাশে
ঝিরিঝিরি পড়ে বৃষ্টি,
ভিজে পাতা থেকে জল পড়ে তাই
এ কী অপরূপ দৃষ্টি।

কাঠামোতে আজ মাটি চেপেছে
দুর্গাপুজোর সূচনা,
জানালার কাঁচে জমেছে কুয়াশা
একে আজ তুমি মুছোনা।

হঠাৎ দৃষ্টি চলে গেল একটা আতা গাছের দিকে। দেখি, একটা পায়রা আতা গাছের নিচে পড়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ। কাগজ কলম রেখে উঠে গিয়ে দেখি তার ডানদিকের পাখনা জখম হয়েছে। তার পাশে পড়ে আছে কিছু খাবার। হয়তো বাচ্ছাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল খাবারটা। আমি একটা খাঁচা আর একটু ওষুধ নিয়ে এলাম। খাঁচাটা ঘরেই ছিল। এক সময় খাঁচাটায় একটা কোকিল থাকত। পায়রাটাকে ওষুধ লাগিয়ে ওই খাঁচাতে ভরে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি ও খুব ছটফট করছে। খাঁচা খুলে ওকে বের করে আনলাম। বাইরে আনতেই দিব্যি ডানা মেলে উড়ে গেল। আমি আবার লিখতে বসলাম —

হঠাৎ দেখি গাছের নিচে
পড়ে আছে এক পাখি,
উঠিয়ে দেখি সে জখম হয়েছে
তাই খাঁচায় ভরে রাখি।

আবার চোখ গেল সেই গাছের নীচে। দেখি, পাখিটা আবার এসেছে। চেষ্টা করছে মাটিতে পড়ে থাকা খাবারগুলো তোলার। কিন্তু পারছে না। বেশ কয়েক বারের চেষ্টায় সে খাবারগুলো মুখে তুলে ফেলল। এবার ওই খাবার নিয়ে উড়ে গেল। আকাশে যখন তাকে ডানা মেলে উড়তে দেখে মনে মনে বললাম শরতের আশীর্বাদ যেন তার ওপরেই ঝরুক। এই প্রার্থনা জানিয়ে আবার লিখতে শুরু করলাম —

আসছে উমা সবার ঘরে
আসছে পুজা মণ্ডপে,
শরতে আজ কাশের বনে
হাসছে যেন মুখ চেপে।

বিসর্জনের পরে তাই
মনটা দুঃখে ভরে আসে,
গঙ্গানদীর মাঝে দেখি
দুর্গা মায়ের মূর্তি ভাসে।
দুর্গা মায়ের মূর্তি ভাসে।

ধোনির জন্য জয়ধ্বনি

সুরজিৎ দাশ (ষষ্ঠ শ্রেণী)

আমার প্রিয় খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেট আমার ধ্যানজ্ঞান। আমি যেমন ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালোবাসি, তেমনই ক্রিকেট খেলতেও ভালোবাসি। আমার প্রিয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। তিনিই আমার আদর্শ। তাঁকে দেখেই আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন। তিনি ভারতবাসীকে দ্বিতীয়বার ক্রিকেট বিশ্বকাপ দিয়েছেন। কপিল দেবের পর ধোনিই এই কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির জন্ম ৭ জুলাই ১৯৮১ রাঁচিতে। বাবার নাম পান সিং, মায়ের নাম দেবকী দেবী। তাঁরা দুই ভাই আর এক বোন। ভাইয়ের নাম নরেন্দ্র আর বোন জয়ন্তী। আদর করে সবাই ডাকত মাহি নামে। সারাদিন ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেটে কেটে যেত মাহির জীবন। রাঁচির ডিএভি জওহর বিদ্যা মন্দিরে পড়ার সময় ব্যাডমিন্টন ও ফুটবল খেলা ছিল তাঁর প্রিয়। ফুটবল খেলার সময় সময়ের হুঁশ থাকত না। স্নান খাওয়া ভুলে শুধুই খেলছে। ফুটবলে গোলকিপার খেলত। সেখান থেকে কী করে ভারতের ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার এবং ব্যাটসম্যান হয়ে গেল ভাবলে অবাক লাগে।

একদিন এক কাণ্ড হল। তার স্কুলের ম্যাচে কোনো উইকেট কিপার পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে না পেয়ে খেলার স্যার মাহিকেই উইকেট কিপার হতে বললেন। সে তো কিছুতেই রাজি নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্যারের অনুরোধ তাকে রাখতেই হল। এক রকম অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে পায়ে প্যাড এঁটে, হাতে গ্লাভস পড়ে উইকেটের পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হল। সেই ম্যাচ তাঁরা জিতেও গেলেন। সেদিন থেকেই মাহির ক্রিকেট খেলা শুরু। প্রথমে কমাণ্ডো ক্রিকেট ক্লাবে খেলতে খেলতে অনধর্ব-১৬ ভিনু মানকড় ট্রফিতে খেলার সুযোগ হয়, তারপর অনধর্ব-১৯ সি কে নাইডু ট্রফি, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলার সুযোগ পান। বিসিসিআই তাঁকে জাতীয় ক্রিকেট আকাডেমিতে পাঠায়। আর তাকে ফিরে তাকাতে হয় নি। ভারতীয়-এ দলের পর ২০০৪-২০০৫ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে একদিনের সিরিজে জাতীয় ক্রিকেট দলে জায়াগা পান। প্রথম সাফল্য এল পাকিস্তানের সঙ্গে একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে। বিশাখাপত্তনমে ১২৩ বলে ১৪৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস ধোনি যুগের সূচনা করল। এরপর একের পর এক রেকর্ড আর সাফল্য এসেছে ধোনির ঝুলিতে।

২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়, ২০১০ সালে এশিয়া কাপ, ২০১১ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০১৩ সালে আইসিসি চাম্পিয়ানস্ ট্রফি সবই এসেছে ধোনির অধিনায়কত্বে। ২০১১-র বিশ্বকাপ ফাইনালে ধোনির ৭৯ বলে ৯১ রানের ইনিংস কাপ জেতায়। ভারতীয় অধিনায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী টেস্ট ম্যাচ এবং একদিনের ম্যাচ জেতার রেকর্ড ধোনির। তাঁর অধিনায়কত্বের সময়ই ভারত প্রথমবার টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর হয়। দেশের হয়ে সাফল্যের পাশাপাশি আইপিএল-এও ২০১০ ও ২০১১ তে সিএসকে-কে অধিনায়ক হিসাবে চ্যাম্পয়ন করেছেন। মোট ৯০ টি টেস্ট ম্যাচ খেলার পর ২০১৪ সালে ধোনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন।

ধোনি তাঁর খেলোয়াড় জীবনে অনেক পুরস্কার জিতেছেন। প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে দু'বার আইসিসি প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার হয়েছেন। ২০০৭ সালে দেশের সবচেয়ে বড় খেলার পুরস্কার 'রাজীব খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড' জেতেন। এত জয়ের প্রধান কারন হল তাঁর ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার মাথা। কখন কাকে কোথায় ব্যবহার করলে কাজ হবে সেটা তিনি খুব ভালো বোঝেন বলেই সমস্ত চাপ কাটিয়ে উঠতে পারেন আমাদের সকলের প্রিয় 'ক্যাপ্টেন কুল।' তোমায় আমার সহস্র অভিবাদন।

সব খেলার সেরা

সৌমাভ সরকার (চতুর্থ শ্রেণী)

আমাদের বাড়ির পাশের মাঠে যখনই ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা হয় তখন মাইকে এই গানটা বাজতে শুনি। গানটায় বলা হয় ফুটবল বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় খেলা। ফুটবল পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা সেটা আমি বইয়ে পড়েছি। কিন্তু একে কেন বাঙালীর সেরা খেলা বলে তা বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে যা শুনলাম তাতে খেলাটার প্রতি ভালোবাসা আরো বেড়ে গেল। তাই শুধু খেলা দেখা বা খেলোয়াড়দের নাম জানা নয়, আমি খেলাটার ইতিহাসও জানতে চাইলাম। নানান বই পড়ে আমি যা জানলাম তা তোমাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

১৯১১ সালে আই.এফ.এ. শিল্ড প্রতিযোগিতায় মোহন বাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব ব্রিটিশ ফুটবল দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয়। পরাধীন দেশের মানুষের কাছে এই জয় স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিল। মোহনবাগানের এগারো জন খেলোয়াড় বীরের সম্মান পেয়েছে বাঙালীর কাছে। তাদের সঙ্গে ফুটবলও বাঙালীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। আজও বাঙালী মোহন বাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলা নিয়ে মেতে ওঠে, ঝগড়া করে।

এদেশে ফুটবল খেলার প্রচলন করেন নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী। কলকাতা যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার রাজধানী ছিল, তখন এখানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী নিয়মিত ফুটবল খেলত। ভারতীয়দের ফুটবল বলতে কলকাতায় ক্যালকাটা এফ.সি., মোহনবাগান, শোভাবাজার আর এরিয়ান ক্লাব ফুটবল খেলত। ১৮৯২ সালে শোভাবাজার ক্লাব ট্রেডার্স কাপ জেতে। এটিই কোনো ভারতীয় ক্লাবের জেতা প্রথম ট্রফি। মোহনবাগান ক্লাব স্থাপিত হয় ১৮৮৯ সালে। ১৯১১ সালে ব্রিটিশদের হারিয়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

ফুটবল কবে থেকে খেলা হচ্ছে, কোথায় খেলা শুরু হয়েছে এসব জানতে গিয়ে দেখলাম 'সুজু' নামের একটা প্রাচীন খেলা থেকে ফুটবল খেলার জন্ম হয়েছে। চিনা ভাষায় 'সুজু' কথার অর্থ 'বলে লাথি মারা'। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে সেনা বাহিনীর মধ্যে এই খেলার চল ছিল। প্রাচীন চিনের তথ্য অনুসারে 'সুজু' খেলাটা হল একটি চামড়ার বলকে লাথি মেরে একটা সিল্কের কাপড়ে করা গর্তের মধ্যে দিয়ে গলানো। এই গর্ত করা সিল্কের কাপড়টা বাঁশের খুঁটিতে টাঙানো থাকতো। হান বংশের রাজত্বকালে 'সুজু' খেলার নিয়ম কানুন তৈরী হয়। জাপান এবং কোরিয়াতেও এই সুজুর মতই খেলা দেখা যায়। তবে তাদের নাম আলাদা — কেমারী আর চুক-গুক।

প্রাচীন গ্রিক ভাস্কর্যে ফুটবল খেলা

প্রাচীন গ্রিক ও রোমানরাও বল নিয়ে নানা রকম খেলা খেলতেন। যার মধ্যে কয়েকটা পা দিয়েও খেলা হত। রোমে হারাপাস্তম নামে একটা খেলা হত যা আজকের ফুটবলের মত। গ্রিক নাট্যকার এন্টিফেনাসের একটি নাটকে ফাইনিন্দা নামে একটা খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটিকেও ফুটবলের পূর্ব রূপ বলে মনে হয়। এছাড়াও নানা দেশে ফুটবলের মত খেলা প্রচলিত থাকার কথা জানা যাচ্ছে। তবে ফুটবলের শুরু যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক, এ খেলা চিরদিনই আমাদের প্রিয় খেলা হয়েই থাকবে।

পু রী ভ্র ম ণ

অভিনন্দা মুখোপাধ্যায় (চতুর্থ শ্রেণী)

কয়েকদিন ধরেই পুরী যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমার। মা কলেজ থেকে এসে যখন বললো যে, ‘বাড়িতে বাবার কয়েকজন বন্ধু আসবে, তাই আমরা পুরী যাচ্ছি,’ সেই শুনে তো আমি আনন্দে ১০০ খানা হয়ে গেলাম! তারপর মায়ের ব্যাগ গোছাতে সাহায্য করলাম। নিজেও রেডি হলাম এক ঘন্টা ধরে। তারপর সন্ধ্যে ৬টায় টোটো করে সাঁত্রাগাছি স্টেশনে পৌঁছালাম। আমাদের ট্রেনটা পুরী স্পেশাল, সেটা ছাড়ল সন্ধ্যে ৭টায়। ১৪ তারিখে ট্রেনে চাপলাম, ১৫ তারিখে ভোর ৩টার সময় পুরী পৌঁছে গেলাম। স্টেশন থেকে গাড়ি করে হলিডে হোমে এলাম। সেখান থেকে সূর্যোদয় দেখতে গেলাম। তারপর সূর্যোদয় দেখে আমরা সমুদ্রে নামলাম। বাবার বন্ধুদের সঙ্গে একটা ছেলে আর মেয়েও এসেছিল। আমরা তিন জনে সমুদ্রে নামলাম, নামার আগে আমি উঠের পিঠে চাপলাম। একটু ভয় লাগছিল। তারপর সমুদ্রে স্নান করে আবার হলিডে হোমেও স্নান করলাম। তারপর ব্রেকফাস্ট। লাঞ্চ করে আমার ইচ্ছে করল আবার একবার সমুদ্রে যাবো। গেলাম, আবার স্নান করে ফিরলাম। ঘরে এস্যে আর একবার স্নান করলাম। এবার শুয়ে ঘুমোলাম। বিকেলবেলা ৫টার সময় সমুদ্রের ধারে বসতে গেলাম। ফেরার সময় দাদু ও দাদার জন্য সুন্দর দেখতে ঝিনুকের চাবির রিং কিনলাম। মনিমা আর দিদার জন্য নিলাম দুটো গয়নার বা । তারপর আইসক্রিম খেতে খেতে ফিরলাম। পরের দিনও একই ভাবে কাটালাম। খালি সূর্যোদয় দেখাটা বাদ। তৃতীয় দিন কোনার্ক, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দেখতে গেলাম। ওইদিন রাতের ট্রেনে চেপে আবার বাড়ি ফিরে এলাম।

অর্ণব কোলে (দ্বিতীয় শ্রেণী)

ÕòÅÃÎ ö •äÅÂ Ç| í Ï“ অগ্রসেন বালিকা বিদ্যালয়)

কুইজ

২০১৫-এর ডিসেম্বরে ফেলুদার গল্প প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। তাই শারদীয়া ক্যুইজের বিষয় তোমাদের সকলের প্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা। উত্তর আছে এই বইয়েরই কোনো না কোনো পাতায়। এটুকু খোঁজাখুঁজি ফেলুদার ভক্তরা নিশ্চয়ই করতে পারবে। কি পারবে তো?

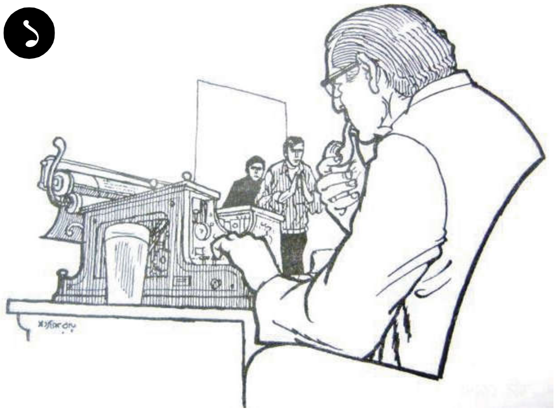

১. ছবিতে কে কী টাইপ করছে?

২. ফেলুদার রিভালবারটির নাম কী?

৩. মগনলালের প্রাইভেট সার্কাসের খেলা দেখে লালমোহন বাবু অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর দিকে ‘নাইফ’ ছুঁড়ছিল কে?

৪. ফেলুদার হাতে এক বিশেষ ধরনের জুতো। এই জুতোর নাম কী, এর বৈশিষ্ট্যই বা কী?

৫. ফেলুদা বিদেশের কোন শহরে?